শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

স্বপ্না প্রেস লিমিটেড্

৮।১ লালবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা—১

প্রচ্ছদশিল্পী—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

৩ টাকা

শ্রীমতী গৌরীকে

ব্রঞ্জের মৎস্যকন্যা ঃ কোপেনহেগেন বন্দরের প্রবেশ পথ

মধ্যযুগে ডেনমার্কেব কৃষিক্ষেত্র
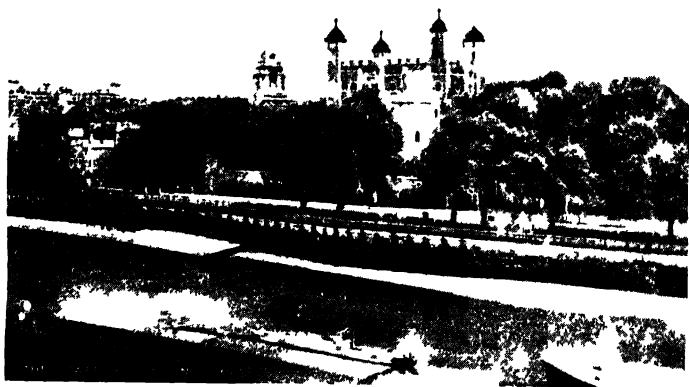
টাওযাব অব লণ্ডন

কালাপানি পাড়ি দেবার সৌভাগ্য ও আভিজাত্য অর্জন এপর্যন্ত ভাগ্যে ঘটে নি। কোনদিন যে ঘটবে তারও কোন আশু সম্ভাবনা দেখি নি। বন্ধুরা প্রায়ই বলতেন, "ওহে, যে করেই হোক একবার বিলেতটা ঘুরে এসো ; দেখতেই তো পাচ্ছ, যা সরকারী হালচাল তাতে গায়ে একটু বিলাতী গন্ধ না থাকলে চাকরির বাজারে কল্কে পাওয়া কঠিন।" কথাটি যে সত্যি তাতে ভুল নেই। দীর্ঘদিন ইংরেজ প্রভুদের প্রভাবাধীনে থেকে বিলাতীর মোহটা আমাদের বড্ড পেয়ে বসেছে। এমন কি স্বাধীনতা-লাভের পরেও আমরা এই হীনমন্যতার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করি নি। বিদেশ ভ্রমণ ও বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয়—সে খুব বড় জিনিস। ব্যক্তিগত বা জাতিগতই হোক, মনের প্রসার ও দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা এ দুই হচ্ছে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ফল। ইতিহাসে নজীর আছে, যে সময় থেকে হিন্দুরা বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে, সমুদ্রযাত্রাকে বর্জন করে নিজেদের চারদিকে একটা সংকীর্ণতার প্রাচীর তুলে আত্ম-তুষ্ট হয়ে বসে রইলো, সেই সময় থেকে শুরু হলো তাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক অধঃপতন। কিন্তু বিলাতীর মোহ আর বিদেশ ভ্রমণ এক জিনিস নয়। কবির কথা একটু উল্‌টিয়ে বলা যেতে পারে, "বিদেশের কুকুর পূজি, স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" অর্থাৎ বিলাতী যাই হোক না কেন, তাই ভাল ; দেশের যা কিছু সব নিকৃষ্ট। সরকারী মহলে এ ধরনের মনো-ভাবাপন্ন বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁদের বিলাতী ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার মোহ অত্যন্ত প্রবল। এবং এই ভাব-প্রাবল্যের সুযোগ নিচ্ছেন অনেকেই—তাঁরা টাকা খরচ করে যেমন তেমন একটা বিলাতী ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নিয়ে এসে চাকরির বাজারে জাঁকিয়ে বসেন। বিলাতের সস্তা ডিগ্রীধারী

বহুকেই দেখেছি। বেশীর ভাগই বিলেত থেকে শিখে আসেন কতকগুলি ঝুটা আদবকায়দা কারণে অকারণে বা স্থানে অস্থানে সেইগুলি জাহির করে স্ব-প্রাধান্য স্থাপন করবার একটা অশোভনীয় প্রয়াস করে থাকেন। বিলাতী বা ইউরোপীয় সভ্যতার যে প্রকৃত উৎকর্ষ—ইউ-রোপীয় ভাবধারার যে নিগূঢ় তাৎপর্য তা কয়জন বিলাত-ফেরত ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন! বিলাতী সভ্যতার আপাত-চাকচিক্যেই আমরা বেশীর ভাগ লোক এতটা অভিভূত হয়ে পড়ি যে খোলসটাকেই আঁকড়ে ধরি—আর ভিতরের আসল বস্তুটা থেকে যায় নাগালের বাইরে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীও বিলেত গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সবল ব্যক্তিত্ব বিলাতী সভ্যতায় আচ্ছন্ন হতে পারে নি ; বরঞ্চ তাঁদেরই প্রভাবে বিলাতী সভ্যতা নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে।

প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই খবর পেলাম যে "কলম্বো পরিকল্পনার" সর্তানুযায়ী ভারত থেকে চারজনকে অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হচ্ছে সেখানকার সমাজসেবা বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবার জন্য—এবং সেই চার জনের মধ্যে আমিও একজন। যেতে হবে প্রথমে মেলবোর্ণ শহরে। সেখানে দু-মাস থাকতে হবে। পরবর্তী প্রোগ্রাম পরে জানানো হবে। বিলাত না হোক, বিদেশ তো! মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। কালাপানি পার হতে হবে, আর ইংলণ্ডেরই দোসর অস্ট্রেলিয়া—এই ভেবেই খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা গেলো। বন্ধুবর্গ মহাখুশী!

কলকাতা থেকে বিমান যোগে যাত্রার দিন ধার্য হয়েছে ১১ই জানুয়ারী, ১৯৫২। সংবাদটি আমি যখন পেলাম তখন থেকে মাত্র দু-সপ্তাহ সময় থাকলো প্রস্তুত হবার জন্যে। তাড়াহুড়া লেগে গেল। পাশপোর্ট, হেলথ্-সার্টিফিকেট, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সর্বোপরি টাকাকড়ির ব্যবস্থা করতে কম হয়রানি ভোগ করতে হয় নি! যাহোক শেষটায় মোটামুটি সব কিছুই গুছিয়ে নেওয়া গেলো।

এমারেল্ড বুদ্ধের দেশ

১১ই জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ১০টায় দমদম বিমানঘাঁটি থেকে যাত্রা করতে হবে। দমদমে এসে হাজিরা দিতে হবে অন্তত সাড়ে আটটায়। আমাদের বেলগাছিয়া বাসা থেকে একটা বড় গাড়িতে সবাই দমদম রওনা হলাম বেলা সাড়ে সাতটায়। বাবা, মা, স্ত্রী, বোন, ছেলেমেয়ে ও আরও অনেকে মিলে ছোটখাট বেশ একটি দল এলেন দমদম বিমানঘাঁটিতে আমায় বিদায় দেবার জন্য।

করাচী থেকে K. L. M. (Royal Dutch Air Line) কোম্পানীর বিরাট Constellation বিমানপোত যথাসময়ে দমদম এসে হাজির হলো। কাস্টমসের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে বিমানপোতের দিকে রওনা হলাম। বাবা-মা প্রভৃতি নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে সস্নেহে অশ্রুসজল দৃষ্টিতে বিমানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বার বার পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে বিমানপোতের ভিতর ঢুকে পড়লাম। ভিতরে রাশি রাশি জোড়া আসন। ভাগ্যে আমার আসনটি পড়েছিল একটি গবাক্ষের ধারে! যদিও পুরু কাচে ঢাকা, তাহলেও সেই গবাক্ষ দিয়ে তাকিয়ে সবাইকেই দেখতে পেলাম। তাঁরা আমাকে আর দেখতে পান নি; তবুও আমার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে, রুমাল উড়িয়ে বিদায় জ্ঞাপন করতে লাগলেন। দূরে আমার মায়ের কোলে ছোট্ট গোপাল (ছেলে)—তাকেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো।

এ আমার দ্বিতীয় বিমান-যাত্রা। ছাত্রজীবনে একবার আধঘণ্টার জন্য শখের বিমান-ভ্রমণ করেছিলাম। তারপর এতদিন পরে আবার এই আকাশ-ভ্রমণের সুযোগ মিললো। দীর্ঘ যাত্রাপথ ও অনভ্যস্ততা এই দুইয়ে মিলে মনে মনে বেশ একটু উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিলো।

বিরাটকায় বিমানপোত। ভিতরে সত্তর জন আরোহীর বসবার ব্যবস্থা আছে। চারটি প্রবল শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাহায্যে এই বিরাট যন্ত্র-জটায়ু দুই বিস্তৃত পক্ষে ভর দিয়ে মহাশূন্যে উল্কার বেগে ছুটে যায়। এর স্বাভাবিক গতি গড়ে ঘণ্টায় ৩৮০ থেকে ৪০০ মাইল। ইঞ্জিনের হুঙ্কার শুরু হতেই ভিতরে যাত্রীদের চোখের সামনে লাল আলোর সতর্ক-বাণী জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো :—Fasten your seat-belt : no smoking please. এরোপ্লেন উড়বার পূর্বে, আর ভূমিতে অবতরণ করবার সময় যাত্রীগণকে সাবধান হতে বলা হয়। বিমানঘাঁটির দীর্ঘ র‍্যানএওয়ে (run away) বরাবর বিমানখানা প্রায় আধ মাইল ছুটে গিয়ে ধীরে ধীরে মাটির মায়া কেটে শূন্যে উঠে গেলো। বিমানের অপরিসর গবাক্ষ দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্রমে দমদম বিমানঘাঁটি, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, কলিকাতা মহানগরী ও পুণ্যতোয়া গঙ্গা… সবই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়ে গেলো। ·বিমান ক্রমশই উচ্চ হতে আরও উচ্চে উঠে যেতে লাগলো—মেঘপুঞ্জ বিদীর্ণ করে নিঃশব্দে শূন্যপথে আরম্ভ হলো বিমানের অবাধ যাত্রা। নীচে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি নানা বর্ণ বৈচিত্র্যে সুদর্শন। কখনো বা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক আধ ঝলক মাটির পৃথিবীর আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে আভাস মাত্রই। নদী-গিরিপ্রান্তর সবারই এক অবিচ্ছিন্ন বামন রূপ।

বিমানখানা কখনো কখনো পনর ষোল হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু দিয়ে যাচ্ছিলো, আর সেই সময়ে ভিতরেও বেশ শীত বোধ হচ্ছিলো। অবিশ্যি হাতের কাছেই আছে গরম কম্বল, ইচ্ছে হলেই গায়ে জড়িয়ে নিবিড় হয়ে বসা যায়। বিমান পরিচারক ও পরিচারিকা (Steward and Air Hostess) আরোহীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এতক্ষণে যাত্রীদল যার যার আসনে স্থির হয়ে বসে কেউ বা ধূমপান করছেন, কেউ বা কোন ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোচ্ছেন, আর

কেউ বা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আরোহীরা বেশীর ভাগই ডাচ্ বা হল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং ডাচ্ নিউগিনির যাত্রী। ভারতীয় আমরা তিনজন এবং তিনজনই অস্ট্রেলিয়াগামী। একজন ভারতের পশ্চিম উপকূলবাসী, একজন দক্ষিণী আর বাঙ্গালী আমি। আমাদের তিনজনের আসন পড়েছিলো পাশাপাশি, তাই আলাপ-পরিচয় শীঘ্রই জমে উঠলো। পশ্চিম উপকূলবাসী ভদ্রলোকের নাম বি. ভি. চন্দ্রা, আর দক্ষিণী ভদ্রলোকের নাম আনন্দ সাহু। খানিকটা আলাপ করেই বুঝলাম যে দুজনেই বেশ একটু interesting ধরনের লোক। চন্দ্রা মশায় এর পূর্বে বিলেত গিয়েছিলেন, খুব বিলেতের গল্প করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা বিলেতের আদব-কায়দা তাঁর মতো কেউ ভালো জানে না, কথায় কথায় তিনি আমাদের নানা বিষয়ে সাবধান করে দিতে লাগলেন। সাহু মশায় আবার অনেকটা এর বিপরীত। সাধারণ ভব্যতারও বড় একটা ধার ধারেন না—প্রায়ই কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক ভাব—নিজের দিকে ছাড়া অপরের প্রতি লক্ষ্য দেবার বড় একটা অবসর পান না। তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন যে তিনি একজন বিখ্যাত আধুনিক কবি এবং তাঁর রচিত কাব্য পৃথিবীর বহু ভাষাতেই নাকি তর্জমা হয়েছে—যদিও দুঃখের বিষয়, এঁর কাব্য পড়া দূরে থাক, এমন কি এঁর নাম পর্যন্তও ইতিপূর্বে আমার জানা ছিলো না, সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করতে হলো।

প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই চন্দ্রা ও সাহু মশায়ের মধ্যে কেমন একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠলো। চন্দ্রা মশায় মহা-আড়ম্বরে Stewardess-এর কাছ থেকে কতকগুলি বিলাতী ম্যাগাজিন নিয়ে এসে পাতা উল্টোতে লাগলেন, আর সাহু মশায়কে এটা ওটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যেতে লাগলেন। আমি ভাবগতিক দেখে সংক্ষেপে আত্মপরিচয় সেরে একটু আলগা থেকে এদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

চন্দ্রা মশায়ের মাতব্বরি সাহু মশায় বেশীক্ষণ বরদাস্ত করতে না পেরে উল্টো মাতব্বরি শুরু করে দিলেন। কেউই হঠবার পাত্র নয়। এক-জন হচ্ছেন বিলাতী আদব-কায়দা-দোরস্ত অভিজাত, আর একজন হচ্ছেন কবি-দার্শনিক-সাম্যবাদী ইত্যাদি। সংঘর্ষ অনিবার্য। খানিকক্ষণ বাদানুবাদের পর চন্দ্রা মশায় সাহুকে বললেন, "আপনার সাধারণ বুদ্ধি বড় কম,—you lack in common sense।" আশ্চর্যের বিষয় সাহু মশায় কোনো একটা সদুত্তর না দিয়ে মুখভার করে গুম হয়ে বসে থাকলেন। এর পরেও চন্দ্রা-সাহুর মধ্যে অনেকবার কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাটি হয়েছে এবং প্রায় বারই চন্দ্রামশায়ই শেষ কথা (last word) বলেছেন, তার কারণ চন্দ্রামশায় বাক্‌চাতুরীতে অদ্বিতীয়।

K. L. M. প্লেনে যাত্রীদের পান-ভোজনের প্রচুর ব্যবস্থা। নানা রকমারি মদ বিনা খরচে যাত্রীদের দেওয়া হয়। চন্দ্রামশায় আমাকে অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে অন্তত বিয়ার (Beer) পান না করা ইউরোপীয় সমাজে অভদ্রতার সামিল। যদিও বিয়ার পান না করার দোষে পরে অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ড সমাজে আমাকে অভদ্র বলে কেউ মনে করেছে এমন প্রমাণ পাই নি, তবু একথা সত্যি যে মদ খাওয়াটা এসব দেশের সমাজে অতি সাধারণ ব্যাপার। মেয়ে-পুরুষ সবাই অবাধে মদ খেয়ে যাচ্ছে। মদ না খাওয়াটা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক। ড্রিঙ্ক্ বলতে এরা মদ ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। হোটেলে-রেস্তরাঁয় না চাইলে পানীয় জল পর্যন্ত পাওয়া যায় না। হয় মদ, নয় চা, নয় কফি। আর চাইলেও জল পাওয়া যাবে নিক্তির ওজনে বা নির্দিষ্ট পরিমাণে। দুপুরে বা বিকালে লাঞ্চ এবং ডিনারের পূর্বক্ষণে শহরের রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য পানাগারে (bar) দেখা যাবে অগণিত তৃষ্ণার্ত নরনারীর ভিড়। মদের গ্লাস হাতে না নিয়ে এদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশাই ভাল করে করা যায় না।

মদ না খেলেও প্লেনে soft drink বা লেমনেড ও অরেঞ্জ স্কোয়াস পাওয়া যায়—তাই দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করায় বাধা নেই। যাহোক, লাঞ্চ ও বৈকালিক চা-পান প্লেনেই সমাপন করা গেলো। প্লেন ছুটেছে সগর্জনে দুর্নিবার বেগে। নীচে সমস্ত দিগন্ত আচ্ছন্ন করে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি পৃথিবীকে আড়াল করে রেখেছে। কখনো চকিতে ছিন্ন মেঘের রন্ধ্র দিয়ে নীচে জল-স্থলের ক্ষীণ অস্পষ্ট ছায়াটুকু মাত্র দেখা যায়। বিমান ভ্রমণ এদিক দিয়ে বড় একঘেয়ে। শূন্যে ব্যোম অপরিমাণ—কিন্তু যাত্রীদের অবস্থা যেন অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়। মেঘ মুলুকের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। রাশি রাশি মেঘ—কোথাও নিকষ কালো হয়তো বা বজ্রগর্ভ—ঢালবে তৃষিত ধরার বুকে অঝোর ধারা, কোথাও মেঘের রূপ শুচিশুভ্র, আবার কখনো সাতরঙা রামধনুর মতো আলো ঝলমল। মেঘরাজ্যের ভিতর দিয়ে বিমান চালনা বিপদজনক—প্রবল বায়ুস্রোত ও ঝড়ঝাপটার এলাকা এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরুপদ্রব ঊর্ধ্ব অন্তরীপপথেই বিমানের চলাচল পথ।

বেলা গড়িয়ে বৈকাল হয়ে এলো। বিমান চালকের নির্দেশ মতো ঘড়ির কাঁটা ৩০ মিনিট এগিয়ে দিলাম। আমরা এখন শ্যাম রাজ্যের ব্যাংকক শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। নীচে পিছনে পড়ে রইলো বঙ্গোপসাগর ও বর্মা মুলুক।

বেলা চারটায় আমরা ব্যাংকক বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করলাম।

প্রবাদ আছে যে একবার ব্যাংককের বিখ্যাত এমারল্ড বুদ্ধ মূর্তি দর্শন করলে আবার নাকি ভগবান বুদ্ধকে প্রণতি জানাবার জন্য ফিরে আসতে হয়। ভালো কথা। যদি ভগবান বুদ্ধের দয়ায় আবার ব্যাংকক আসতেই হয় তাতে দুঃখিত হব না। কারণ মাত্র যে তিন দিন ব্যাংককে ছিলাম তার মধ্যে ব্যাংককের সব কিছু ভাল করে দেখা সম্ভবপর হয়ে

ওঠে নি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি তাতে শহরটি ও শহরের মানুষগুলিকে বেশ ভালই লেগেছে।

শহর থেকে ১৪।১৫ মাইল দূরে বিমানঘাঁটি। K. L. M.এর মোটর বাসে প্রথমে মাইল তিনেক দূরবর্তী ডাচ্ পান্থপালা প্লাজ-উইকে (Plaswijck) যাত্রীদের নিয়ে আসা হলো। K. L. M.এর অতিথি হিসেবে এখানেই তিনদিন বাস করতে হবে।

চমৎকার ব্যবস্থা! প্লাজ-উইকের বাড়িটি নাকি পূর্বে থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বা অধিনায়ক পিবুল সংগ্রামের পল্লীভবন ছিল, পরে K. L. M. কিনে নেয়। আন্তর্জাতিক বিমান পরিচালনা প্রতিষ্ঠানগুলির— বিশেষ করে K. L. M কর্তৃপক্ষের যাত্রীদের প্রতি ব্যবহার তারিফ করবার যোগ্য। পয়সা এরা যথেষ্টই নেয় বটে, কিন্তু সুখসুবিধার ব্যবস্থাও করে অকৃপণভাবে। কলকাতা থেকে ব্যাংকক-ম্যানিলা-রিয়াক হয়ে সিডনি অবধি রিটার্ণ টিকিটের দাম দিতে হয়েছিলো তিন হাজার টাকার কিছু বেশী। রিটার্ণ টিকিট না কিনে এক তরফা টিকিটের দাম পড়ে আরও কিছু বেশী—যাতায়াতে চার হাজার টাকা।

কিন্তু বিমানে আরোহণ করার পর থেকেই যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য— আহার-পানীয়, থাকা, এমন কি দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন সব কিছুর ব্যবস্থাই কোম্পানী করে থাকে। প্লাজ-উইকের সুপরিসর ও সুসজ্জিত কক্ষে থাকার বন্দোবস্ত হলো। পৌঁছানোর অব্যবহিত পরেই steward প্রত্যেক যাত্রীকে কুপন দিয়ে গেলো, সে কুপন দিয়ে পান্থশালার পানাগারে বিনা পয়সায় মদ ও অন্য পানীয় পাওয়া যেতে পারে। আমার কুপনকয়টি চন্দ্রামশায় নিলেন।

প্রাতরাশ, লাঞ্চ, বৈকালিক চা ও ডিনারের উত্তম বন্দোবস্ত রয়েছে। K. L. M. নিজেদের মোটরবাসে করে যাত্রীদের প্রতিদিন শহরে নিয়ে

যায় এবং দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাবার বন্দোবস্ত করে দেয়—এর জন্য কোন পয়সা খরচা করতে হয় না।

তিনদিন ঘুরে ঘুরে ব্যাংকক শহর দেখলাম। বোম্বাইয়ের নিউ ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর স্থানীয় ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নানাবতীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। ভদ্রলোক খাতির করে একদিন তাঁর বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করলেন।

ব্যাংকক শহরটি দুই ভাগে বিভক্ত—মাঝখান দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত, নদীর দুই তীর সুপ্রশস্ত সেতু দ্বারা সংযুক্ত। বিমানঘাঁটির দিক থেকে শহরে প্রবেশ করতেই প্রথমে চোখে পড়বে বুদ্ধের স্মৃতি স্তম্ভ। তারপর দীর্ঘ ও চওড়া রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে ক্রমে রাজ-প্রাসাদ, রাজা রামের অশ্বারূঢ় মর্মর মূর্তি, ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী দপ্তরখানা, বড় বড় হোটেল, বাজার ও সারি সারি দোকান দেখতে দেখতে শহরের কেন্দ্রস্থলে আসা যাবে। যাত্রীদের পথপ্রদর্শক হয়েছিলো K. L. M. কোম্পানীর কর্মচারী একটি থাই মেয়ে—নাম সুপীত, মেয়েটি তরুণী এবং সপ্রতিভ। বাসে যেতে যেতে রাস্তার দুধারের প্রধান প্রধান স্থানগুলির পরিচয় দিয়ে যেতে লাগলো।

থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশ ও ভারতবর্ষ এই দুয়ের মধ্যে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বহু সাদৃশ্য ও সংযোগ বর্তমান রয়েছে। এদের নামগুলি যে সংস্কৃতজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বেশীর ভাগ লোকই হয় বৌদ্ধ নয় খৃষ্টান। বৌদ্ধধর্ম এদেশে প্রচারিত হয়েছিলো ভারতীয় তথা বাঙালী দ্বারা খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে।

বাঙালী ঔপনিবেশিকরা এক সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণী বহন করে এনেছিলো। দ্বীপময় ভারতের নানা বিক্ষিপ্ত অংশে আজও পর্যন্ত ভারতের সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে অসংখ্য মঠ-মন্দির, স্থানীয় লোকের

ভাষা, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, অভিনয়, লোকনৃত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি।

"স্থপতি যাদের রচনা করিল বরোভূধরের ভিত্তি,
শ্যাম-কম্বোজ-ওঙ্কার ধাম তাদেরই মহান্ কীর্তি।"

ব্যাংককের বৌদ্ধ মন্দিরগুলি কবির উক্তি সমর্থন করছে। বিখ্যাত পো মন্দিরের এমারেল্ড বুদ্ধমূর্তি দর্শন করতে গেলাম। অনেকটা স্থান জুড়ে মন্দির ও তৎসংলগ্ন চত্বর। নানা কারুকার্যখচিত মন্দিরের অভ্যন্তরে সু-উচ্চ বেদীর উপরে সমাসীন ভগবান তথাগতের ধ্যানমূর্তি। নীচে কার্পেটাচ্ছাদিত মেঝেতে জনকয়েক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পুণ্যলোভাতুর নরনারী মুদিত নেত্রে উপাসনা করছেন। বুদ্ধের ধ্যানমূর্তির পাদদেশে দুই পার্শ্বে দুইটি সুদৃশ্য পিলসুজে রক্ষিত তৈল-প্রদীপের আলোকে সেই বৃহৎ মন্দির-কক্ষের অন্ধকার কিঞ্চিৎ নিবারিত হচ্ছে। মন্দির অভ্যন্তরে বেশ একটা শান্ত, গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিমণ্ডল।

প্রধান মন্দিরটিকে চক্রাকারে পরিবেষ্টন করে রয়েছে অনেকগুলি কক্ষ। এই কক্ষগুলির প্রাচীরে অঙ্কিত আছে সমগ্র রামায়ণের মুখ্য আখ্যানগুলির তৈলচিত্র। ভারতের শাশ্বত মহাকাব্য রামায়ণ বৃহত্তর ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত!

শ্যামদেশীয় রামায়ণের ইংরাজী তর্জমা প্রকাশ করেছেন ইন্দো-থাই-সংস্কৃতি পরিষদ। ইন্দো-থাই পরিষদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ ও প্রীতি স্থাপন। থাই রামায়ণে মূল রামায়ণের আখ্যানটি অপরিবর্তিত থাকলেও প্রধান কয়েকটি চরিত্রের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে। যেমন রামায়ণ-বর্ণিত মহাবীর হনুমানকে আমরা জানি, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পৌরুষ ও বীর্যবত্তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসাবে। থাই রামায়ণের হনুমান সাহসী বীর বটে, কিন্তু কামুক ও পরদারগামী! ব্যাংককে থাকাকালীন বাঙালী শিল্পী শ্রীশুভো ঠাকুরের

সঙ্গে দেখা হলো। তিনি সেই সময়ে ইন্দো-থাই পরিষদের উদ্যোগে ব্যাংককে তাঁর নিজস্ব চিত্রকলা ও ভারতীয় শিল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করছিলেন। কয়েকজন পাঞ্জাবী ও কাথিয়াবাড়ী ভদ্রলোকের দেখাও পেলাম। এঁরা প্রায় সবাই ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে অনেকদিন এদেশে আছেন। এঁদের মুখে গত মহাযুদ্ধের সময় এদেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আগমন, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সংগঠন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম। এদেশের ভারতীয়রা নেতাজীকে আদর্শ জাতীয় নেতা হিসাবে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করে।

১৩ই জানুয়ারী রবিবার বেলা চারটার সময় ব্যাংকক ছেড়ে ফিলি-পাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা অভিমুখে রওনা হলাম। আবার সেই শূন্যপথে এরোপ্লেনের সবেগ ও সগর্জন পরিক্রমণ শুরু হলো। সহযাত্রীদের মুখ কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে লক্ষ্য করলাম। অনেকেই ব্যাংককে নেমে গেছেন—তাঁদের স্থান অধিকার করেছেন নবাগতের দল। আমার ঠিক পিছনের আসনেই বসেছিলেন একজন বৃহৎ-বপু ওলন্দাজ ভদ্রলোক। ভদ্রলোক ভারি আলাপী। খানিকটা বাদেই ঘাড়ে টোকা মেরে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "Having a nice trip ?"—অর্থাৎ এসো আলাপ করি। আমার পাশের শূন্য আসনে আমন্ত্রণ জানাতেই উঠে এলেন। তারপর কথাবার্তা আরম্ভ হলো। ভদ্রলোক সুরা-রসিক। আমার মদ চলে না শুনে হাত নেড়ে হতাশার সুরে মন্তব্য করলেন, "Ah ! Half life's wasted ?" আমি বল্লুম "I mean to waste the whole life." তিনি আবার দুহাত প্রসারিত করে হতাশার ভঙ্গী করলেন।

এদিকে ভদ্রলোকের দু পা ফুলে গোদের মতো হয়েছে—জুতো জোড়া পায়ে না পরে হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ওদিকে পেগের পর

পেগ গিলছেন। মাঝখানে একবার Pantryর দিকে উঠে গেলেন। ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, "Interested in engine, are you ?" হেসে বল্লেন, "Oh no! Rather interested in gin!" খানিক বাদেই steward আবার মদ পরিবেশন করে গেলো।

এই চললো বেলা চারটা থেকে প্রায় রাত আটটা অর্থাৎ ডিনারের প্রাক্কাল পর্যন্ত।

সেদিনটা ছিলো কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। ভেবেছিলাম মেঘলোকের উপরে চন্দ্রালোকিত নভোমণ্ডলের কতোই না সৌন্দর্য প্লেনে বসে দেখা যাবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হলো। এরোপ্লেন ভ্রমণ প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। ছোট্ট কাচে ঢাকা গবাক্ষ দিয়ে সীমাহীন দিঙ্‌মণ্ডলের সামান্য অংশটুকু মাত্রই চোখে পড়ে। কোথায় সেই চাঁদের হাসির বান—যা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে মুক্তধারায়! চাঁদের কাছে এসে যেন চাঁদকে হারিয়ে ফেলা! হঠাৎ হয়তো এক ঝলক চাঁদকে দেখা গেলো। গগন কোণে—"ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা", আবার তার পরমুহূর্তেই সে কোথায় যেন হারিয়ে গেলো তার হদিস নেই! অন্ধকারময় মহাশূন্যে মানুষের অমিত স্পর্ধার নিদর্শন এই ব্যোমযান যেন উল্কার সংগে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে এক বিষম আবেগে।

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে,
বিশ্ব-জগত নিশ্বাস বায়ু সম্বরি'
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।

হে যন্ত্র-বিহঙ্গম, অব্যাহত থাকুক তোমার গতিবেগ—চলুক তোমার সগর্জন পক্ষ-বিধুনন—

আছে মহা নভো অঙ্গন,
ঊষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা
এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

কিন্তু ক্রমেই বিমানের গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে বিমানখানা নীচের দিকে নামছে বোঝা গেলো। নামার সময় সামান্য একটু স্পন্দন অনুভূত হয়। নচেৎ বিমান ভ্রমণে এক কাণে-তালা-লাগা গর্জন ভিন্ন অন্য কোন রকমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি হয় না। এক যদি বায়ুমণ্ডলে কোন উপদ্রব থাকে, বিমান-ভ্রমণ তাহলে হয় কষ্টদায়ক।

উপর থেকে গবাক্ষ-পথে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি যেন সমস্ত ভূপৃষ্ঠে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ-সাদা লক্ষ আলোর মেলা। নিশীথ নগরীর এক অপূর্ব অভিসারিকার বেশ। ম্যানিলার ঘাঁটিতে বিমানপোত অবতরণ করলো রাত বারোটায়। বিমানঘাঁটি থেকে শহর চার পাঁচ মাইল দূরে। অত রাত্রে শহর পরিভ্রমণের কোন সুবিধা হলো না, তা ছাড়া ঘণ্টা দুই মাত্র বিশ্রামের পর আবার উড়তে হবে ডাচ্ নিউ-গিনির অন্তর্গত বিয়াক দ্বীপের অভিমুখে। কাজেই কোনমতে বিমানঘাঁটির অফিসে বসেই দুঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। রাত দুটোয় আবার শুরু হলো যাত্রা।

চলন্ত বিমানে ঘুম বড় একটা হলো না, যদিও স্প্রিংয়ের আসন হেলিয়ে দিয়ে সারা দেহ কম্বলে আবৃত করে অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকা গেলো। তবে তন্দ্রার ভাব এসেছিলো। তন্দ্রা কেটে গেলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি জগৎ সংসার আলোময় হয়ে উঠছে—নীচে বহুদূরে আবছা আবছা ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জলরাশি। ক্রমে দিনের আলো ফুটে উঠলো—বুঝলাম আমরা এখন সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছি। অনন্ত বিস্তার নীল জলরাশির মাঝে মাঝে শাদা-রেখায় পরিবেষ্টিত ছোট বড় সবুজ দ্বীপ। এগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জেরই কোনো না কোনোটা। প্রথম দৃষ্টিতে এগুলি যে দ্বীপ তা বুঝা যায় না, মনে

হয় যেন সমুদ্রেরই অংশ। কিন্তু ঐ সাদা রেখার পরিবেষ্টনটি হচ্ছে তরঙ্গতাড়িত শুভ্র ফেনার রেখা। আর এই দ্বীপগুলি প্রায়ই ঘনসন্নিবিষ্ট নারিকেল ও অন্যান্য ট্রপিক্যাল বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন, তাই সবুজ দেখায়। বিয়াকে অবতরণ করলাম সকাল ছটায়—স্নান ও প্রাতরাশের জন্য যাত্রীদের সময় দেওয়া হলো ঘণ্টা দুই।

বিয়াক ডাচ্ নিউ-গিনির অন্তর্গত হলেও একটি বিচ্ছিন্ন ছোট্ট দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একখণ্ড সবুজ জমির ফালি। সারা দ্বীপটি গাছ-গাছালিতে ঢাকা—নারিকেলই অধিক, আর আছে অজস্র পেঁপে ও ডুমুর গাছ। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে আমেরিকানরা একটা বেশ বড় রকমের যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরি করেছিলো—তার চিহ্ন এখনও ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে প্রচুর দেখা যায়—পরিত্যক্ত ডায়নামো (dynamo), টারবাইন (turbine), ভাঙ্গা মোটর লরী ইত্যাদি। বিয়াকে এখন K. L. M.এর একটা বিমান ঘাঁটি রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানগুলি এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। ইন্দোনেশীয়া স্বাধীনতা অর্জন করার পর হতে K. L. M. বিমানপোত জাকার্তা বিমানপোতে অবতরণ করার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। তাই K. L. M বা ডাচ্ বিমানগুলি বিয়াকের পথে চলাচল করে। কিন্তু B. O. A. C. (British Overseas Air Company) প্লেন যথারীতি জাকার্তা হয়েই যাতায়াত করে। বিয়াকের লোকসংখ্যা অতি সামান্য। বিমান ঘাঁটি তদারকের কাজে নিযুক্ত জনকয় কর্মচারী—প্রায় সবাই ডাচ্ আর কয়েকজন নিউগিনির পলিনেশীয় অধিবাসী।

চারদিকে সমুদ্রে ঘেরা এই ছোট্ট দ্বীপের অধিবাসীরা যেন সেই গল্পের রবিনসন ক্রুশো।

* * *

বিম্নাক থেকে সিডনি দীর্ঘ পথ। বেলা আটটায় রওনা হয়ে রাত প্রায় দশটায় সিডনির ম্যাসকট বিমানঘাঁটিতে নামলাম। অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র বিভাগীয় কর্মচারী মিঃ বারম্যান বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য। সে রাত্রে সিডনির ওরিয়েন্ট হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা হলো। পরদিন ভোরে আবার বিমানযোগে শেষ গন্তব্য স্থান মেলবোর্ণ যেতে হবে।

এ যাত্রায় সিডনি শহরের কিছুই দেখা হলো না। ১৫ই জানুয়ারী বিমানযোগে সিডনি থেকে মেলবোর্ণ এসে পৌঁছলাম বেলা প্রায় এগারটায়।

আদিমতম মানুষের দেশ

ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন যে পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাদেশ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। মালয় উপদ্বীপের সুদীর্ঘ পুচ্ছ ও তার নিকটবর্তী পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নাকি এক সময়ে পরস্পর সংযুক্ত ছিলো এবং এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া এই দুই মহাদেশ ছিলো এক অবিচ্ছিন্ন মহাভূখণ্ডের অংশ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই দুই মহাদেশের সংযোগ-সেতু স্মরণাতীতকালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যায়। যে অংশগুলি সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হয়ে যায়, সেগুলি ছিলো পর্বতসঙ্কুল ভূমি। এখন ভারত মহাসাগরের পূর্বাংশে এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তবর্তী সে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি সেই নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণীর শীর্ষদেশ। প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে এশিয়া ভূখণ্ডের সহিত অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। অজ্ঞাত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঐতিহাসিক যুগের বহু দিন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া বিস্মৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করে ছিলো। আনুমানিক ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একদল মানুষের চাপে এশিয়ার

পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলনিবাসী একদল কৃষ্ণকায় আদিম মানুষ সমুদ্র অতিক্রম করে আশ্রয়ের আশায় আরও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে। এই কৃষ্ণকায় মানুষই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বা আদিম অধিবাসী। সঠিক কোন্ সময়ে এবং কোন্ জায়গা থেকে বা কি উপায়ে এই আদিম মানুষের দল সমুদ্রবেষ্টিত অজ্ঞাত মহাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলো, সে কাহিনী চিরদিনের মত অকথিত রয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় যে আদিম মানুষ বা অ্যাবরিজিন (aborigines) দেখতে পাওয়া যায় তারা সেই আদিম শরণার্থীদেরই বংশধর। এদের গায়ের রং নিকষ কালো, মাথার চুল সোজা, নাক ঈষৎ চাপা। কিন্তু এদের মাথার খুলি, চোয়ালের হাড় এবং চুল পরীক্ষা করে নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে এরা নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর মানুষ নয়। এরা হচ্ছে বর্তমান শ্বেতকায় ইউরোপীয় জাতিগণেরই আদিম পূর্বপুরুষ। নৃতত্ত্ববিদের পরিভাষায়—"A white stock gone black।"

ইতিহাসের যে যুগে মানুষ প্রথম নৌকা যোগে দরিয়ায় পাড়ি দিতে শুরু করে, সে সময়ের কাহিনী ও কিংবদন্তীতে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও এক একটা অনিশ্চিত বা কল্পনামূলক ইঙ্গিত কখনো কখনো পাওয়া যায়। সে সময়ে অনেকে বিশ্বাস করতো যে পৃথিবীর (পূর্বগোলার্ধের) উত্তরাংশের এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীর দক্ষিণভাগেও একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আছে। ভারতবর্ষ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নাবিকগণের মুখে মুখে এই অজ্ঞাত ও কাল্পনিক মহাদেশের নানা কথা চারিদিকে প্রচারিত হতো। ১৫০ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট লুসিয়ানের রাজসভায় মারসুপিয়াল (Marsupial) নামক একজাতীয় অদ্ভুত জীবের কথা আলোচিত হতে দেখা যায়। বিবরণে প্রকাশ যে এই জীবের পেটে বাচ্চা রাখবার থলে ছিলো। Marsupial যে ক্যাংগারু জাতীয় জীব সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহের অবকাশ নাই। ক্যাংগারুর বাসভূমি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া।

ইউরোপীয় ইতিহাসে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতক হচ্ছে অভিযান এবং আবিষ্কারের যুগ। কলম্বাসের ঐতিহাসিক অভিযানের বিস্ময়কর সাফল্য ইউরোপীয় নাবিক ও বোম্বেটেগণকে এক নূতন নেশায় উন্মাদ করে তুলেছিলো। প্রথমে স্পেন, পর্তুগল, হল্যাণ্ড এবং পরে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির দুঃসাহসিক নাবিকেরা এই বিশাল পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশগুলি খুঁজে বের করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলো। ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভারতে আগমন করবার পরবর্তী সময়ে ভারত সমুদ্র এবং সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ইউরোপীয় বণিক ও অভিযান-কারিগণের কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতক পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দিকে এই সকল অভিযানকর্তাদের নজর পড়ে নি। ভারত সমুদ্রের মাঝামাঝি এসে এই নাবিকেরা trade-wind বা বাণিজ্য-বায়ুর গতি অনুসরণ করে সোজা পূর্বদিকে না গিয়ে, উত্তরদিকে মোড় ঘুরে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির দিকে অগ্রসর হতো। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে টোরেস (Torres) নামক একজন স্পেন দেশীয় নাবিক খুব সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইনস্‌ল্যাণ্ড প্রদেশের পূর্ব উপকূলের ত্রিশ মাইলের মধ্যে এসেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার কথা তখন কেউ বড়ো একটা জানতো না। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূল জাহাজ ভিড়বার পক্ষে অনুকূল ছিল বটে, কিন্তু একমাত্র মালয় উপদ্বীপবাসী দুর্দান্ত ধীবর সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ এদিকে নজর দিত না।

আর মালয়ী ধীবরেরা উপকূল সন্নিহিত সমুদ্রে মাছ ধরেই ক্ষান্ত থাকতো। ভূভাগের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিলো না। সমস্ত দেশটাকেই তারা 'মৃতের দেশ' ব'লে অভিহিত করতো।

কিন্তু পূর্বভারতীয় দ্বীপ এবং প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ থেকে পর্তুগীজ নাবিকগণকে বিতাড়িত করে ওলন্দাজ নাগরিকগণের প্রভুত্ব-লাভের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ নাবিকেরা খাস অস্ট্রেলিয়ায় না এলেও, এর আশেপাশে আনাগোনা শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অনাবিষ্কৃত অন্ধকারময় মহাদেশ ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর গোচরে আসতে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী অনেক জায়গার নাম থেকে অনুমান করা যায় যে এই সকল স্থানে সম্ভবত ওলন্দাজ বা অন্য ইউরোপীয় নাবিকগণ এসেছিলো। কিন্তু ভূমির অনুর্বরতা, পার্বত্য উপকূলভাগের বন্ধুর অনাতিথ্য তাদের মনকে এই নূতন দেশের প্রতি প্রসন্ন করে তুলতে সক্ষম হয় নি। অধিকাংশ আগন্তুকেরাই দেশটাকে অনুর্বর ও অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছে।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন জেমস কুক নামক একজন ইংরাজ নাবিকের এদেশে আসার পর থেকেই প্রকৃত পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার নূতন ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। যদিও আরও পূর্বে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ডেম্পিয়ার অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিম উপকূলভাগে পদার্পণ করেছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে আবেল ট্যাসম্যান নামক আর এক ব্যক্তি কর্তৃক ট্যাস্‌ম্যানিয়া আবিষ্কৃত হয়েছিলো।

কিন্তু এই আবিষ্কারের পরবর্তী বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের কেউ এই নূতন দেশগুলির কথা ভেবে দেখবার অবসর পায় নি। এদিকে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে ইংলণ্ডের পরাভবে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হলো। দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীগণকে পূর্বে আমেরিকায় পাঠান হতো। আমেরিকা স্বাধীন হয়ে যাবার পর সে পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

কাপ্তেন কুক প্রথমে রাজকীয় পোত "এন্‌ডিভার" (Endeavour) চালনা করে প্রশান্তমহাসাগরীয় তাহিটি দ্বীপে উপস্থিত হন। তাঁর জাহাজের আরোহীগণের মধ্যে ছিল একদল জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিক।

এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শুকতারা বা Venus-এর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা। সেই বৎসর Venus-এর গতিপথ সূর্যের পরিক্রমণপথের উপর দিয়ে যাবার কথা ছিলো। তাহিটি দ্বীপে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শেষ হওয়ার পর, কাপ্তেন কুক অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলভাগে অবতরণ করেন। এই আবিষ্কারের ফলে এই নতুন মহাদেশের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং কুকের আবিষ্কারের ঠিক সতের বৎসর পর কাপ্তেন ফিলিপ নামক এক নৌসেনাধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীনে একদল দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীকে এদেশে দ্বীপান্তরে পাঠান হয়। কাপ্তেন ফিলিপ হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শাসনকর্তা। বিনা বাধায় ও বিনাযুদ্ধে এত বড় একটা মহাদেশ ইংরাজের করতলগত হলো। ইংরাজের প্রথম উপনিবেশ হচ্ছে নিউ-সাউথ-ওয়েলস্—যার বর্তমান রাজধানী সিড্‌নি—অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম নগর। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের রাজধানী মেলবোর্ণ নগরের ফিট্‌জরয় গার্ডেনে কাপ্তেন কুকের কুটীর আজও (Capt. Cook's cottage) অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত আছে।

কাপ্তেন কুকের ইয়র্কশায়ারস্থিত পৈতৃক বাসগৃহটি তুলে এনে অস্ট্রেলিয়া-আবিষ্কারকের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

* * * *

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও নবীনতম মহাদেশ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। হাজার হাজার বৎসরের বিস্মৃতির অবগুণ্ঠন অপসারিত করে বিশাল মহাদেশকে সভ্যজগতের নিকট পরিচিত করলো দুর্ধর্ষ ইংরাজ নাবিক। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে চললো। মাত্র ১৭০ বৎসরের কথা। এরই মধ্যে একটা গোটা সভ্যতা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গড়ে উঠেছে। শ্বেতাঙ্গ নাবিকের পদার্পণের পূর্বে এই অজ্ঞাত ও বিস্মৃত মহাদেশের অবস্থা কি ছিলো—সেটা আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের পরম কৌতূহলের বিষয়। যে কৃষ্ণবর্ণ মানব-গোষ্ঠী এদেশের আদিম অধিবাসী

ও প্রকৃত মালিক, তাদের নিয়ে আজ পণ্ডিত সমাজে কিছু কিছু গবেষণা চলেছে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন নৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক—Prof. Elkin এবং Dr. Capell-এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। অবসরপ্রাপ্ত Director of Nature Affairs and Adviser to the Commonwealth Govt. on Aborigines, Mr. Chinnery অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণের কল্যাণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

আদিম অধিবাসী সমস্যা সম্বন্ধে এদের সুচিন্তিত অভিমত ও পরিকল্পনা বিবেচনার যোগ্য।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ আদিম অধিবাসীগণের সংরক্ষণ ও কল্যাণ-সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের এই নতুন নীতির নাম হচ্ছে Policy of Assimilation। ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবিকার্জনের ব্যবস্থা—এই তিন উপায়ে আদিম অধিবাসীগণকে ক্রমে ক্রমে শ্বেত অস্ট্রেলিয়ান সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলাই—Policy of Assmilation-এর মূল উদ্দেশ্য। আদিম অধিবাসীরা সাধারণত দুই শ্রেণীর—(১) অবিমিশ্রিত বা full-blooded aborigines (২) মিশ্রিত বা half-castes। Assimilition Policy বা একাঙ্গীকরণ নীতি প্রধানত দ্বিতীয় শ্রেণী বা half-casteদের উপরেই প্রযোজ্য। একদিক দিয়ে একাঙ্গীকরণ খুব কঠিন বলে মনে হয় না। কারণ দেখা গেছে যে এক, দুই বা বড় জোড় তিন পুরুষের রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই কালা মানুষ তার কালোত্ব ঘুচিয়ে একেবারে শ্বেতাঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার আয়তন ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ, অথচ লোকসংখ্যা মাত্র ৮০ লক্ষ। জন-বিরলতা এদেশের একটা প্রধান সমস্যা। লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্য এরা অনেক কিছু উপায় অবলম্বন করেছে। প্রত্যেক

অস্ট্রেলিয় নাগরিক অনূর্দ্ধ ষোল বৎসর বয়স্ক সন্তানের জন্য সরকারী তহবিল থেকে নির্দিষ্ট হারে ভাতা পেয়ে থাকে। শাদা চামড়া অর্থাৎ ইউরোপীয় যে কোনো জাতীয় লোকের জন্যই অস্ট্রেলিয়ার দ্বার অবারিত। কিন্তু শাদা চামড়ার আভিজাত্য এরা ছাড়তে নারাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার Apartheid নীতির মতো অতো উগ্র কালা-বিদ্বেষী না হলেও শ্বেত অস্ট্রেলীয় নীতি (White Australian Policy) কালা আদমির প্রতি বিশেষ প্রসন্ন নয়। কালা আধিবাসীদিগকে শ্বেতাঙ্গ-রক্তে শোধন করে লোকবিরলতা সমস্যা সমাধানের একটা উদ্দেশ্য Assimilation Policy-র মধ্যে নিহিত রয়েছে। আজ গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় নানা মিশনারী প্রতিষ্ঠান এই হাফ্‌-কাস্ট্‌ নেটিভগুলিকে ক্রমশ অস্ট্রেলিয় সমাজভুক্ত করে ফেলবার কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

কিন্তু হাফ্‌-কাস্ট নেটিভ আর অবিমিশ্রিত (full-blooded aborigines) আদিম অধিবাসী, এ দুয়ের সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। একশত সত্তর বৎসর পূর্বে প্রথম যখন ইংরাজ ঔপনিবেশিক এদেশে আসে তখন সারা দেশে আদিম অধিবাসীর সংখ্যা ছিলো তিন লক্ষ। কমতে কমতে সেই সংখ্যা আজ দাঁড়িয়েছে মাত্র পঁচাত্তর হাজারে। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণস্থ টাসম্যানিয়া দ্বীপ থেকে আদিম মানুষের দল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। খাশ অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি বিভাগ বা রাজ্য— কুইনস্‌ল্যাণ্ড, নিউ-সাউথ ওয়েলস্‌, ভিক্টোরিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া। পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল ভূমিই উর্বর, শস্যোৎপাদনোপযোগী এবং বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। মহাদেশের মধ্যভাগ এবং উত্তরভাগ মরুময়, পর্বতসঙ্কুল, অনুর্বর ও নির্জলা। দেশের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অংশ সবই শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত। সেখানে কালা আদমির প্রবেশ নিষেধ। মধ্য ও উত্তরাংশের উষর পার্বত্য ভূমিই কালা মানুষের একমাত্র বাসভূমি।

স্মরণাতীত কাল হতে এই কালো মানুষের দল এদেশকে আপনার করে নিয়েছিলো। জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন অবস্থায় থাকতে থাকতে এরা নিজেদের অবস্থার উন্নতি বা পরিবর্তন সাধন করবার আদৌ কোন সুযোগ পায় নি। বনে, প্রান্তরে, মরুভূমি ও পাহাড়ে পর্বতে প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আদিম মানুষের দল এক পরিবর্তনহীন আরণ্য যাযাবর জীবন যাপন করে আসছিলো। প্রকৃতির কোলে নির্বোধ শিশুর মতো এরা উলঙ্গ বিচরণ করতো।

প্রথম যখন শ্বেতজাতির এদেশে আগমন হলো তখন এরা এই নতুন আগন্তুকদের না করলো সাদর অভ্যর্থনা, না করলো প্রতিরোধ। অভ্যর্থনা বা প্রতিরোধ দুই ছিল এদের পক্ষে অর্থহীন। অভ্যর্থনা করবার মতো এদের ছিলো না কোন সম্পদ, আর প্রতিরোধ করবার মতো ছিলো না এদের কোন কৌশল বা অস্ত্র শস্ত্র। হেতা হোতা দুএকটা মাছ ধরার ফাঁদ, কোথাও বা গাছের ডাল পালা দিয়ে তৈরী সাঁকো, গাছের বাকলে তৈরী এক চালা ডেরা (mia-mia), পাহাড়ের গায়ে গুহা আর আগুন-ছাই —এই ছিলো সারা দেশে মানুষ-বসতির একমাত্র নিদর্শন। শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকেরা এদের এক রকমের আজব মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে নি, এরা রেড ইণ্ডিয়ান বা আফ্রিকার পিগমিদের মতো নতুন আগন্তুকদের সঙ্গে লড়াই করবার চেষ্টাও করে নি, কারণ লড়াই করবার উপযোগী কোন হাতিয়ারও এদের ছিলো না। নতুন আগন্তুকদের দল প্রায় বিনা বাধায় এদের জায়গা জমি, অবাধ বিচরণ স্থল, অরণ্য ভূমি দখল করে নিলো। এরা অনন্যোপায় হয়ে অপেক্ষাকৃত উত্তম উপকূলভাগ ছেড়ে মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেলো। দেশের ভাল ভাল জায়গা সবই আগন্তুকদের করতলগত হলো—এদের ভাগে রইলো অনুর্বর, জলহীন পার্বত্য ঊষর ভূমি। জীবন ধারণের যেগুলি প্রধান প্রয়োজনীয় উপকরণ, সেগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে এরা জীবন

সংগ্রামে প্রতি পদে পর্যুদস্ত হতে লাগলো। আর তারই ফলে ১৭০ বৎসরের মধ্যে তিন লক্ষ কমে আজ মাত্র পঁচাত্তর হাজারে দাঁড়িয়েছে। এই ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু জাতির কোন ভবিষ্যৎ নেই। হয় এরা assimilation policyর প্রসাদে শ্বেতাঙ্গ সমাজের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে, নতুবা ধীরে ধীরে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজ নৃতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরাই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষের বংশধর। এদের বিলুপ্তিতে মানুষের সনাতন বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের পক্ষে সেটা হবে একটা শোচনীয় ক্ষতি। তাই বোধ করি আজকাল অস্ট্রেলীয় গভর্ণমেণ্ট, তথা জনসাধারণ এই আদিম মনুষ্য-গোষ্ঠীর অবশিষ্টাংশকে বাঁচিয়ে রাখবার কথা চিন্তা করছেন।

নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও মানুষের ক্রম-বিবর্তনের দিক দিয়ে আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রাপ্রণালী, আচার ব্যবহার, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি এক অতি চমৎকার এবং অনুধাবনীয় বিষয়।

মানব-সৃষ্টির আদিকাল হতে এরা প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে এক অকৃত্রিম আরণ্য-জীবন যাপন করে আসছে। এদের জীবনেতিহাসে ক্রম-বিবর্তনের ইঙ্গিত বড়ই ক্ষীণ। প্রকৃতিকে এরা কোথাও লঙ্ঘন করে নি, প্রকৃতির নিয়মকেই এরা সর্বতোভাবে মেনে নিয়েছে। যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি সেখানে প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা না করে, বিনা প্রতিরোধে পরাভব স্বীকার করে নিয়ে বিলুপ্তি বরণ করে নিয়েছে। এই আদিম মানুষের জীবনে "জ্ঞানবৃক্ষের" প্রলোভন কোন দিন দেখা দেয় নি। এরা নির্লিপ্ত, নিরুদ্বেগ আরণ্য-জীবন যাপন করে আসছিলো

হাজার হাজার বৎসর ধরে। হয়তো আরো হাজার বৎসর এমনিভাবেই কেটে যেতো, যদি না ইউরোপীয় শ্বেত নাবিকের বিশ্বগ্রাসী শ্যেন-দৃষ্টি এই মহাদেশের উপর পড়তো। বাইরের জগতের সঙ্গে কোন দিন এদের যোগাযোগ ছিলো না। এদের জীবনে বাইরের কোন প্রভাব কোনদিন পড়ে নি এবং প্রতিযোগিতাহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই মানুষের দল প্রায় একই অপরিবর্তিত অবস্থায় হাজার বৎসর কাটিয়ে দিয়েছে।

সর্বপ্রথম যে মানুষের দল এদেশে আসে, তারা ছিলো খুব সম্ভবত নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—রং কালো, বেঁটে, ঠোঁট পুরু এবং থ্যাবড়া, মাথার চুল ভেড়ার লোমের মতো কোকড়ানো। এরা কিন্তু বেশীদিন এ মহাদেশে বসবাস করতে পারে নি, কারণ এদের পরে পরেই এল আর একদল, যারা নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দ্বিতীয় দলের ধাক্কায় প্রথম দল ছিটকে পড়লো আরও দূরে—দক্ষিণের ট্যাসম্যানিয়া দ্বীপে। এই দ্বীপে এরা প্রায় ত্রিশ হাজার বৎসর নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করে আসছিলো। মাত্র একশত বৎসর আগেও ট্যাসম্যানিয়ায় এই আদিম মানুষের কিছু চিহ্ন ছিলো। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকের অত্যাচারে এরা সম্পূর্ণ নির্বংশ হয়ে গেছে।

শ্বেতাঙ্গের দল প্রথমে এসেই এদের ভাল ভাল জমি, বনভূমি প্রভৃতি থেকে তাড়িয়ে সেই সব জায়গা নিজেরা দখল করে নিলো। তারপর কখনো সামান্য কারণে, বেশীর ভাগই অকারণে প্রায় পশুর মত এই বন্য মানুষগুলিকে শিকার করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে থাকে। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একবার একটা কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্রোহ পর্যন্ত হয়েছিলো। কিন্তু কাঠের বর্শা আর ব্যুমেরাং নিয়ে এরা বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। সবাইকে হয়

গুলির আঘাতে, নয় দূর নির্বাসনে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিলো। ট্যাসম্যানিয়ার সর্বশেষ আদিম অধিবাসিনী এক কৃষ্ণাঙ্গী—নাম তার ট্রুকানিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ অবধি শ্বেতাঙ্গদের দাসীবৃত্তি নিয়ে বেঁচে ছিলো। মরবার আগে শ্বেতাঙ্গ প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলো যে তার মৃতদেহটি যেন তার জন্মস্থানে সমাহিত করা হয়; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গীর এই শেষ অনুরোধ শ্বেতাঙ্গ প্রভু রক্ষা করে নি। ট্রুকানিনির কঙ্কাল ট্যাসম্যানিয়ার রাজধানী হোবার্ট শহরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ট্যাসম্যানিয়ার কালো নিগ্রোবটুর পরে যে দল এদেশে আসে তারাই হচ্ছে এদেশের 'Aborigines' বা আদিম অধিবাসী। লম্বা, শীর্ণকায়, সোজা লম্বা চুল, গায়ের রং কালো—এই হচ্ছে এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য। এরা হয় Black Caucasians অথবা Dravidians; অর্থাৎ বর্তমান ইউরোপীয় ও পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পূর্বপুরুষ,—পৃথিবীর প্রথম মানুষ। Sir Arthur Keith বলেন "Of all the races of mankind now alive, the aboriginal race of Australia is the one which in my opinion, could serve as a common anscestor for all modern races."

এদের ব্যবহৃত ভাষায় এবং এদের অনেক আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অনেক প্রাচীন জাতির সঙ্গে এদের আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন মানুষকে এরা বলে ইজ্জা (Idja), হিব্রুভাষায় যার প্রতিশব্দ হচ্ছে ইস (ish); পিতাকে এরা বলে আবিয়া (abia), যার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে আব্বা (abba)। এদের বুমেরাং-এর মতো অস্ত্র প্রাচীন মিশরীয়গণ ব্যবহার করতো, যা প্রাচীন মিশরীয় প্রাচীর-চিত্রে খোদিত বা অঙ্কিত দেখা যায়। এদের একটা লিখিত ভাষা বা কতকগুলি

সঙ্কেত চিহ্নও ছিলো, যার অন্তর্নিহিত অর্থ আজ আর কেউ বুঝতে পারে না।

পণ্ডিতেরা এদের প্রস্তরযুগীয় মানুষের গোষ্ঠীভুক্ত করেছেন। স্মরণাতীত কাল হতে এদের জীবনধারা একই অপরিবর্তিত ও বৈচিত্র্যহীন ধারায় প্রবাহিত হয়ে এলেও কতকগুলি বিচিত্র সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা এদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতো।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, প্রকৃতি এদের প্রতি খুব বেশী অনুগ্রহ প্রকাশ করে নি। কি বনজ সম্পদ, কি জীবজন্তু, এমন কিছুই এদেশে ছিলো না, যা থেকে এরা প্রাণধারণের উপযোগী সামগ্রী খুব বেশী আহরণ করতে পারতো। দেশের মাটি অধিকাংশই অনুর্বর, বন্ধুর ও জলাভাবে উষর। ক্যাঙ্গারু, কোয়েলা (খুদে ভালুক) আর প্ল্যাটিপাস ছাড়া অপর উল্লেখযোগ্য বন্য জন্তু এত বড় মহাদেশের কোথাও দেখা যায় নি। গাছপালা প্রায় সবই বুনো ও ফলহীন। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ক্যাঙ্গারুর মাংস, নদী-নালার মাছ, আর দুচার রকমের বুনো গুটি ফল—এই ছিলো এদের একমাত্র সম্বল।

কিন্তু আদিম এবং অনুন্নত হলেও এই মানুষগুলি বুদ্ধিমান জীব। কেবল সুযোগের অভাবেই এরা হাজার হাজার বৎসর ধরে এই অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে নতুন ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে এরা খুব সহজেই সাড়া দেয়। বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন বিভাগে আদিম অধিবাসীদের নিযুক্ত করা হয়েছিলো। নানাভাবেই এরা বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে কারিগরি কাজে এরা খুবই নিপুণ। সুযোগ সুবিধা পেলে এরাও যে শ্বেতাঙ্গদের তালে তাল দিয়ে চলতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কতকগুলি আচার ও প্রথা

উল্লেখযোগ্য। এদের ধর্মবোধ সকল আদিম মানুষের ধর্মবোধের মতোই ভীতি-সঞ্জাত। কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই এদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন নিয়ন্ত্রিত। এই সব অনুষ্ঠানের মূলে হয়তো কোন নিগূঢ় রহস্য বা অর্থ কোনদিন নিহিত ছিলো, কিন্তু আজ সেই রহস্য উদ্ঘাটন করবার উপায় নেই। ফলে এদের আচার অনুষ্ঠান কতকগুলি দৈহিক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবা যায় না। পর্বতগাত্রে অঙ্কিত সঙ্কেতলিপি ও চিত্র, নাচ বা গান কোন কিছুর মধ্য দিয়েই আদিম মূলসূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনো কখনো কোন ক্রিয়া বা লৌকিক আচারের মধ্যে একটু একটু প্রতীকতা বা symbolism-এর প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে এদের কল্পনা বা চিন্তাশক্তির কোন বিশেষ উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্বপ্ন দেখাই এদের জীবনের সর্বোচ্চ আত্মিক উপলব্ধি। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যেন এরা একটা অজ্ঞাত ও রহস্যময় শক্তির ভীতিপ্রদ আভাস পায়। কিন্তু সেই শক্তির কোন অধ্যাত্মিক অনুধ্যান এদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। একটা অদৃশ্য ও অজ্ঞাত ভীতিই হচ্ছে এদের আচার-অনুষ্ঠান, উপকথা বা বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। ভয় কাটিয়ে জ্ঞান, ভক্তি বা উপলব্ধির উচ্চস্তরে এরা কোন দিনই উঠতে পারে নি। মানসিকতার দিক দিয়ে তাই এরা রয়ে গিয়েছে সেই আদিম অন্ধযুগে।

ব্যবহারিক জীবনেও এদের বিশেষ কোন পরিবর্তন বা ক্রমোন্নতি ঘটে নি। হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধানেও এদের আহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতি সেই একই অপরিবর্তিত প্রাকৃতিক অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, অপরিবর্তিত প্রাকৃতিক অবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ সংগ্রামহীনতা—এই তিন কারণেই এদের অবস্থার কোন

পরিবর্তন ঘটে নি। আগুনের ব্যবহার এরা জানতো। কাঠে কাঠে বা পাথরে পাথরে ঘষে এরা আগুন উৎপাদন করতো—কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে অগ্নি-উৎপাদন বা অগ্নির তাপ-সংরক্ষণ এরা করতে শেখে নি। জমি চাষ এরা করতে জানতো না—এই বিরাট মহাদেশে এমন কোন জন্তুও কোনদিন ছিলো না, যা মানুষ পোষ মানিয়ে তার কাজে লাগাতে পারে। ক্যাঙ্গারু-শিকার আর মাছ-ধরা এই ছিলো এদের প্রধান উপজীবিকা। শিকারের অস্ত্র ছিলো পাথর বা কাঠের ফলাবিশিষ্ট বর্শা। তীর ধনুকের ব্যবহার এরা করতে জানতো না। ব্যুমেরাং বা বাঁকা কাঠের হাতিয়ার অস্ট্রেলীয় আদিম মানুষের এক বিশেষ অস্ত্র। মেয়েরা কখনো কখনো গাছের ছালে দেহ আবৃত করলেও উলঙ্গ বিচরণ করাই ছিলো এদের রীতি। গৃহবিহীন অবাধ যাযাবর জীবনের একমাত্র তাগিদ ছিলো আহারান্বেষণ ; গাছের ছালে তৈরী ডিঙ্গি বা canoe নিয়ে বহিস্‌মুদ্রে মাছ ধরায় এরা ক্ষিপ্রতা ও অকুতোভয়তার যথেষ্ট পরিচয় দিতো। সিডনি, মেলবোর্ণ, হবার্টের যাদুঘরে আদিম হস্তশিল্পের যে সব নিদর্শন রক্ষিত আছে তা দেখলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বন্য বর্বর জীবনেও এরা একটা প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে আসছিলো। এদের তৈরী ঢাল, লাঠি, দড়ি প্রভৃতির গঠন-নৈপুণ্যে শিল্পীর একাগ্রতা ও সূক্ষ্ম রসবোধের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক আচার ব্যবহারেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সারাদিনের শিকারে যা কিছু সংগৃহীত হলো সেটা শিকারীর একা ভোগের বস্তু নয়—দলের বা গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট হারে আহার্যের ভাগ পাবে।

মুসলমান এবং ইহুদীদের মতো এরাও ছুন্নত বা circumcission প্রথা পালন করে। স্ত্রীলোকের গর্ভধারণে পুরুষের সঙ্গ বা সহবাস যে প্রাকৃতিক নিয়ম—এই মৌলিক তথ্য এদের কাছে অজ্ঞাত। এদের

বিশ্বাস সন্তান-প্রজনন কোন ভৌতিক প্রভাবের ফল। কোন স্ত্রীলোক কতকগুলি বিশিষ্ট সময়ে কোন বিশিষ্ট জায়গায় গেলেই নাকি তার গর্ভসঞ্চার হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন ও শিক্ষা, পিতার উপর না বর্তে, তার মাতুলের উপর বর্তায়।

ছুন্নত বা circumcission পর্বের পর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন পুরুষই কোন স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে না। অন্যথায় একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু।

ক্যাঙ্গারু-নাচ এদের আমোদ-প্রমোদের একটা বিশেষ অঙ্গ। খেলাধুলা বা অবসর বিনোদনের দিক দিয়ে এদের বৈশিষ্ট্য খুব বেশী নেই। লুকোচুরী খেলার মত এদের ছেলেরাও এক রকম খেলা ভালবাসে। নাম তার কলটা-গরগর। প্রকৃতপক্ষে কঠোর জীবন সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন তাগিদে এদের অবসর বিনোদন ও খেলাধুলার অবকাশ ছিলো খুবই কম।

স্বপ্নপুরী সিডনি

Vedi Napoli, epoi muori.

ইতালীয় প্রবাদ—"নেপল্‌স্‌ দেখে মর।" এ পর্যন্ত নেপল্‌স্‌ (Naples) দেখবার সুযোগ হয় নি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার শহরগুলি দেখে সেই কথাটাই মনে পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার শহরগুলির অবস্থান ভারি চমৎকার! বেছে বেছে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের সানুদেশে জনপদ স্থাপন করা হয়েছে। একদিকে অনন্ত নীল সমুদ্র, আর অপর দিকে অরণ্যসমাকীর্ণ সবুজ পাহাড়-শ্রেণী—তারই মাঝে মানুষের তৈরী সুন্দর শহরগুলি। এম্নি পাহাড়ঘেঁষা একটি উপসাগরের তীরে নিউ-সাউথ ওয়েলসের রাজধানী সিডনি শহর।

উপসাগরের এক পারে খাস সিডনি শহর—অপর দিকে শহরের উপকণ্ঠ—ক্রেমোর্ণ-মোস্‌ম্যান। প্রণালীর দুই তীরকে সংযুক্ত করেছে বিখ্যাত সিডনি ব্রীজ, যার তুলনা নাকি জগতে নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং নৈপুণ্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। একটি মাত্র স্প্যানের (span) উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বিরাট ইস্পাতনির্মিত সেতু। দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় মাইল, আর প্রস্থে আমাদের নতুন হাওড়া ব্রীজেরও দেড়া। উপর দিয়ে মানুষ, মোটর যান, ট্রামগাড়ি ও রেল যাবার ভিন্ন ভিন্ন পথ রয়েছে। দিন রাত যানবাহন চলাচল বিরাম নাই। ব্রীজের দুই প্রান্তে দুটি উচ্চ স্তম্ভ, যার শীর্ষদেশে উঠবার জন্য আছে ইলেক্‌ট্রিক লিফ্‌ট। খুশি হয় মাত্র ৯ পেনি দিয়ে উপরে উঠে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সারা সিডনি শহর এবং অদূর সমুদ্রের দৃশ্য একটিবার দেখে নিতে পারা যায়।

দূরাগত অসংখ্য সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে ভিড় করে রয়েছে। স্টিম ও মোটর লঞ্চ অবিরাম যাত্রি পারাপার করছে। পারানির কড়ি হচ্ছে এক শিলিং। প্রমোদ বিহারের জন্য সুসজ্জিত জাহাজও রয়েছে। চার শিলিং দিয়ে ৬ ঘণ্টার জন্য হারবার ঘুরে আসা যায়। হারবারের দুই তীরেই পাহাড়ের সানুদেশে সুন্দর সুন্দর বাগানঘেরা বাড়ি স্তরে স্তরে সাজান।

রাত্রিতে যখন নগরীর অসংখ্য আলোকমালা জ্বলে উঠে, তখন এই হারবারের দৃশ্য হয় অপরূপ। বাহির দরিয়ায় কতো বিদেশী জাহাজ যাত্রী বা পণ্য বহন করে দূরের পানে ভেসে চলেছে, আবার কতো জাহাজ বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। যেগুলি বন্দরে নোঙর করে রয়েছে সেগুলি আলোয় আলোময়! নাবিকের দল জাহাজ ছেড়ে ডাঙ্গায় নেমে ফুর্তির খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন জেটিতে একদল ভারতীয় নাবিকের সঙ্গে দেখা। এঁরা দলে ছিলো ৭।৮ জন, একজন মাদ্রাজী, আর বাকী সকলেই উড়িষ্যাবাসী। বাংলা

কথা বেশ বোঝে ও বলতে পারে। নানা কথাই এরা বললো। গত তিন বৎসর এরা দেশছাড়া। অস্ট্রেলিয়া থেকে জাপান হয়ে আমেরিকার নানা বন্দরে এদের যাতায়াত। সম্প্রতি এরা কোরিয়া থেকে এখানে এসেছে। এদের জাহাজের নাম ডিভনসায়ার (Devonshire)। ডিভনসায়ার হচ্ছে বৃটিশ জাহাজ, বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে কোরিয়া রণাঙ্গনে সৈন্য পারাপারের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

সিডনি হারবারে সেদিন একটি সাবমেরিনের দেখা মিললো। সাবমেরিনের ছবি দেখেছি বটে, কিন্তু আসল সাবমেরিন জিনিসটা কিরূপ তা এই প্রথম দেখলাম। খুব লম্বা সরু—যেন একটা তাঁতের মাকু, মাঝখানে খানিকটা জায়গা উঁচু, সেইখানে পেরিস্কোপ যন্ত্র বসান। মানুষের যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা অনেক সময়ে জীব জন্তুর চালচলনের অনুকরণে রচিত হয়। সাবমেরিন দেখে কচ্ছপের কথা মনে পড়ে। পুকুরে বা খালে দেখা যায় কচ্ছপ জলের উপরে মাথা তুলে নিশ্বাস নেয়, আর চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে আবার জলের নীচে আত্মগোপন করে। গঠন ও গতিকৌশলে কচ্ছপের সঙ্গে সাবমেরিনের একটা নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। সাবমেরিন জলের নীচে গুপ্তভাবে চলা ফেরা করে, আবার সুবিধা মতো জলের উপরে ভেসে উঠতে পারে। জলের নীচে থাকাকালীন লম্বা চোঙার মতো পেরিস্কোপের সাহায্যে চারিদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বিপদ দেখলে একেবারে জলের নীচে ডুব মারে। সাবমেরিনের কাজ হচ্ছে টর্পেডো মেরে শত্রুর জাহাজ ঘায়েল করা। গত-যুদ্ধে হিটলারের বিখ্যাত U-boat মিত্রপক্ষীয় নৌ-বহরের অপরিসীম ক্ষতি সাধন করেছিলো।

সিডনি শহর অস্ট্রেলিয়ার সব চাইতে বড় শহর, বৃটিশ সাম্রাজ্যের তৃতীয় সর্বপ্রধান নগর বলে এর খ্যাতি আছে। এর জনসংখ্যা ১৪।১৫ লক্ষ। আমাদের কলকাতা বা বোম্বাইয়ের তুলনায় অনেক ছোট।

মেলবোর্ণে প্রায় দুই মাস কাটিয়ে এলাম। মেলবোর্ণ শহরের সৌন্দর্য, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। রাস্তাগুলি প্রশস্ত, ঋজু এবং সযত্ন রক্ষিত। বড় বড় আফিস, হোটেল বা দোকান, বাড়ি আর ছোট ছোট বাংলো বা বাসগৃহ সবই সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক বাড়ির সম্মুখেই ছোট্ট একটু বাগান—এটা হচ্ছে মেলবোর্ণের একটা বিশেষত্ব। সেন্ট. কিল্ডা বিচ্-মেলবোর্ণের বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত দেখবার মতো জায়গা। সামনে অনন্ত-বিশারী নীল সমুদ্র। অর্ধ চন্দ্রাকৃতি উপসাগরের দুই দিকে অনুচ্চ পর্বতমালা—সবুজ গাছপালায় ঢাকা—ফাঁকে ফাঁকে সুদৃশ্য ঘর বাড়ি। সমুদ্রের তীরে তীরে সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত রাজপথ মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে গিয়েছে, যেদিকে ইচ্ছা একশত মাইল অবলীলাক্রমে মোটর হাঁকিয়ে যাওয়া যায়।

ছুটির দিনে, বিশেষত যেদিন গরম পড়ে হাজার হাজার নরনারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রতীরে রৌদ্রতপ্ত বালুকা-শয্যায় এরা গা এলিয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে সূর্যতাপ উপভোগ করে। সান-বেদিং বা রৌদ্র স্নানের উপযোগী পোশাক—বিশেষ করে মেয়েদের পোশাক আমাদের অনভ্যস্ত চোখে একটু বিসদৃশ ঠেকলেও, এদের কাছে এতে দোষণীয় কিছু নেই। তরুণী ও যুবতী মেয়েরা অত্যন্ত অপরিসর বস্ত্রখণ্ডে কটিদেশ ও স্তনযুগল কোনমতে আবৃত করে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লজ্জা-সরমের বালাই নেই। অথচ পুরুষদের বেলায় কড়াকড়ির অন্ত নেই। যে সব হোটেলে থেকেছি সে সব জায়গাতেই আপদলম্বিত ড্রেসিং গাউন না পরে ঘরের বাইরে যাবার জো ছিলো না, অন্যথায় কেবল পায়জামা স্যুট পরিহিত পুরুষ দেখলে লজ্জাশীলা মহিলাবৃন্দের নাকি মুর্ছা যাবার সম্ভাবনা।

কোন এক ভারতীয় মহিলাকে নাকি অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা জিজ্ঞাসা করেছিলো যে পায়ের গোরালি পর্যন্ত বিলম্বিত দীর্ঘ শাড়িকে হাঁটু অবধি

তুলে এই বস্ত্র সংকটের দিনে ব্যয় ও বস্ত্রসংকোচ করায় কি আপত্তি থাকতে পারে? মহিলা কি উত্তর দিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু উত্তর হচ্ছে এই যে, যে কারণে পুরুষের বেলায় হাফ্‌প্যান্ট পরিধান অসামাজিক ও অশোভনীয়—অনেকটা সেই কারণেই ভারতীয় মেয়েদের বেলায় হাঁটু অবধি শাড়ির হ্রস্বতাবিধান অনভিপ্রেত।

সাধারণ ভারতবাসীর ধারণা যে অস্ট্রেলিয়ানরা ইংরাজেরই জ্ঞাতি ভাই। ভাষায়, চালচলনে ও আচার ব্যবহারে তাই বটে। কোন কোন বিষয়ে এরা আবার ইংরাজের চাইতেও গোঁড়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি এরা বহির্জগত, বিশেষত এশিয়া ভূখণ্ড ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ ও উদাসীন ছিলো বললেই চলে। লণ্ডনগামী জাহাজের যাত্রীর কাছে ভারতবর্ষ বলতে বোম্বাই শহর সম্বন্ধে একটু অস্পষ্ট ধারণাই ছিলো যথেষ্ট। ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও শিক্ষা সম্বন্ধে এদের এতটুকু ধারণাও ছিলো না। এখনও পর্যন্ত বহু শিক্ষিত অস্ট্রেলিয়ান ভারতবর্ষ বলতে গান্ধী, নেহেরু, জাতিভেদ (Caste System) ও কাশ্মীর এই কয়েকটি কথা মাত্রই বোঝে। আবার তাও, পাকিস্থানী অপপ্রচারের কল্যাণে বিকৃত অর্থে। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানী পররাষ্ট্র বিভাগের কুৎসা প্রচারের বিরাম নাই।

সম্প্রতি কলম্বো পরিকল্পনার কল্যাণে ক্রমশ অধিকসংখ্যক ভারতীয় নানা বিষয়ে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষনের উদ্দেশ্যে এদেশে আসছে এবং ঘনিষ্ঠ-ভাবে এদেশের নানাশ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ লাভ করছে। এই পারস্পরিক মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়া এই দুই মহাদেশের মধ্যে অধিকতর প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে, আশা করা যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ানদের জাতিগত কতকগুলি গুণ তুচ্ছ হলেও লক্ষণীয়। জাতি হিসাবে এদের এখনও শৈশবাবস্থা। ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের

বংশধর হিসাবে এদের মনোভাব যে ইংরাজ-ঘেঁষা হবে এতে আশ্চর্যের বিশেষ কিছু নেই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ে এরাও ইংরাজের অনুগামী। সম্প্রতি এদের সাহিত্য ও সংবাদপত্রে "অস্ট্রেলীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য" প্রচারের ধূম লেগেছে। অস্ট্রেলীয় সাহিত্য বলে যে জিনিসটাকে এরা জোর গলায় প্রচার করতে চাইছে সেটা আসলে ইংরাজী সাহিত্য বই অন্য কিছু নয়—বিশেষত্ব এইটুকু মাত্র যে ইংলণ্ডের প্রকৃতিক বিবরণের বদলে আমরা পাই অস্ট্রেলীয় প্রাকৃতিক বর্ণনা। পাইনগাছের বদলে গামট্রি (ইউক্যালিপ্টাস), আর লেক ডিস্ট্রীক্টের বদলে বুশ (Bush) এবং নর্দার্ণ ডেজার্ট (Norther desert)। এ ছাড়া এই সাহিত্যের কোন লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য এখনও পর্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে নি। আসল কথা হচ্ছে জাতি হিসাবে এরা এখনও পর্যন্ত কোন Crisis বা সংকটের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও একদিন ইংরাজদের উপনিবেশ মাত্রই ছিলো। প্রধানত যে দুই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্য রূপ পরিগ্রহ করেছে তা হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক-চ্ছেদ, আর দ্বিতীয়ত ইংরাজ ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সংমিশ্রণ।

অধুনা অস্ট্রেলিয়ায় ইউরোপ থেকে দলে দলে immigrant বসবাস করবার জন্য আসছে। এদের মধ্যে আছে ইংরাজ, জার্মাণ, ইতালীয়, ফরাসী, রাশিয়ান, গ্রীক্ প্রভৃতি ভিন্ন জাতির লোক। ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন সংস্কৃতির লোকের সংমিশ্রণে হয়তো কালে এই মহাদেশেও একটা নতুন জাতি-সত্তার সৃষ্টি হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্বেত অস্ট্রেলীয় নীতি সম্বন্ধে দু একটি কথা উল্লেখযোগ্য। আয়তনে ভারতবর্ষের দ্বিগুণ, অথচ লোকসংখ্যা মাত্র নব্বুই লক্ষ। এই বিরাট ভূখণ্ডের অপরিসীম সম্ভাবনা নানাভাবে

মানুষের কল্যাণে লাগবার পক্ষে উপযোগী; যদিও এই মহাদেশের উত্তরাংশ মরুভূমি সদৃশ এবং জলের অভাবে কৃষিকার্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অকেজো। এদের নিজেদের ব্যাখ্যা অনুসারে শ্বেত অস্ট্রেলীয় নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ-নৈতিক। অর্থাৎ এরা চায় না যে এশিয়া ভূখণ্ডের শ্রমজীবীরা এসে এদের উঁচু জীবন-যাত্রার মান নীচে নামিয়ে দেয়। ইউরোপাগত আগন্তুকদের দিক থেকে এই আশঙ্কার কোন হেতু নেই। যদিও এরা অর্থ-নৈতিক নীতি বলে শ্বেত অস্ট্রেলীয় নীতির সমর্থনে একটা যুক্তি খাড়া করেছে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এই যুক্তির অসারত্ব ধরা যায়। শ্বেতকায় জাতির বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব-বোধই হচ্ছে শ্বেত অস্ট্রেলীয় নীতির পরিপোষক—অর্থনীতির দোহাই হচ্ছে মুখোশ মাত্র। মুখে না বললেও এরাও মনেপ্রাণে দক্ষিণ আফ্রিকার উগ্র কালা-বিদ্বেষী ডাঃ মালানেরই সমধর্মী।

জাতিত্বের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অর্জন না করলেও একজন সাধারণ অস্ট্রেলিয়ানকে সর্বাংশে ইংরাজের প্রতিচ্ছবি বলে মনে করা ভুল। দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যমদগর্বে স্ফীত "জনবুলের" চেহারা ও প্রকৃতির মধ্যে যে অহংকার, ঔদ্ধত্য ও উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণ অস্ট্রেলিয়ানের মধ্যে সে সব দোষ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এরা সাধারণতই সামাজিক, মিশুক ও মোলায়েম স্বভাবের। রাস্তায় ঘাটে চলাফেরা করবার সময় ইচ্ছা করেও পথচারী পুরুষ বা মহিলাকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে সহৃদয় ও সৌজন্যপূর্ণ উত্তর পেয়েছি—বিদেশীদের প্রতি এদের ব্যবহার স্বভাবতই আন্তরিকতাপূর্ণ ও মধুর। অবশ্য এখনও পর্যন্ত এদের কোন বৈদেশিক আক্রমণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন প্রথম এদের মনে জাপানী বিভীষিকার সঞ্চার হয়েছে। সানফ্রান্সিস্কো সন্ধির (Japanese Peace Treaty at Sansfrancisco) আলোচনায়

ক্যানবেরা ফেডারেল পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা ডাঃ ইভ্যাটের বক্তৃতার প্রতি ছত্রে সেই জাপানী জুজুর ভয় আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণ অস্ট্রেলিয়ান বৈদেশিক রাজনীতি নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না, কিন্তু শিক্ষিত সমাজ কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে বেজায় আতঙ্কগ্রস্ত। বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব সাধারণ অস্ট্রেলিয়ানের অমায়িকতার একটা বড় কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান জাতিবৈষম্য ও বিদ্বেষের দিনে অস্ট্রেলিয়ানদের অমায়িক ও উদার মনোভাব অনস্বীকার্যভাবে প্রশংসনীয়।

ছোটখাট আরও অনেক ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ানদের ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সিডনি, মেলবোর্ণ ও অ্যাডিলেড প্রভৃতি শহরে যেখানেই গিয়েছি, চোখে পড়েছে সাধারণ পরিচ্ছন্নতা। রাস্তাঘাট, আবাসগৃহ, আফিস-আদালত ও বিপণিশ্রেণী সর্বত্রই একটা সুবিন্যাস, সংযম এবং সুনিয়ন্ত্রণ। শহরের বড় বড় রাস্তায় গাড়ি চলাচলের বিরাম নেই—কলকাতা বা বোম্বাইয়ের তুলনায় এ সব শহরে জন প্রতি মোটর-গাড়ির সংখ্যা অনেক বেশী—অথচ শহরের কোথাও, কি বড় রাস্তায় কি ফুটপাথে কোন হৈ-চৈ বা হট্টগোল এতটুকু নেই। রাস্তায় পুলিশ বড় একটা দেখতেই পাওয়া যায় না, অথচ সর্বত্রই সুশৃঙ্খলভাবে অসংখ্য যানবাহন ও জনতা পথ অতিবাহন করে চলেছে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে নিউজ স্টল—প্রাতে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে ও যথাস্থানে দেখা যাবে সংবাদপত্র ও জর্নাল প্রভৃতি সাজান রয়েছে, কিন্তু প্রায় স্থানেই কোন হকার বা বিক্রেতা নেই। পথচারীর দল যথারীতি মূল্য—তিন পেনি বা চার পেনি দিয়ে কাগজ নিচ্ছে। পয়সাগুলি ট্রেতে একধারে স্তূপাকারে জমছে—যথাসময়ে মালিক এসে এগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে। রাস্তার ধারে এভাবে রক্ষকবিহীন পয়সার স্তূপ আমাদের দেশের শহরে পড়ে থাকতে পারে কি?

ওদেশে চুরি, ডাকাতি, জুচ্চোরি বা জালিয়াতি নেই একথা বলব না। কিন্তু শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে জাতির নৈতিক চরিত্র যে অনেকখানি উন্নত হয়েছে তার বহু প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে সত্যবাদিতা ও সরল ব্যবহার অস্ট্রেলিয়ান চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ।

সরকারী অফিস-আদালতেও এদের কর্মতৎপরতা ও সময়নিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য। ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, ইমিগ্রেসন আফিস যেখানেই কর্মব্যপদেশে যেতে হয়েছে—কোথাও অকারণে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করতে হয় নি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত রয়েছে একটি অনুসন্ধান বিভাগ। সেই প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যে কোন সংবাদ অনুসন্ধান বিভাগে মিলবে। কোন আগন্তুককেই অযথা হয়রানি হতে হয় না। আমাদের বড় বড় সরকারী অফিসেও কোন অনুসন্ধান বিভাগের বালাই নেই। কোন কাজ নিয়ে কোন অফিসে গেলে অনেক সময়েই এ টেবিল থেকে সে টেবিল, এ কেরাণীবাবু থেকে সে কেরাণীবাবু—ঘুর ঘুরে হয়রাণ হতে হয়।

একদিন সিডনির জেনারেল পোস্ট আফিসে এক ভারতীয় ভদ্রলোক মনের ভুলে ডাকটিকিট না লাগিয়েই তাঁর একখানা চিঠি ডাক বাক্সে ফেলে দেন। কয়েক ঘণ্টা বাদে—বাসায় ফিরে এসে সে কথা তাঁর মনে পড়ে। তখন উপায় কি? অথচ চিঠিখানা তার বিনা টিকিটে বেয়ারিং হয়ে যাওয়া বিশেষ কারণে অনভিপ্রেত। পোস্টমাস্টার জেনারেলকে ফোন করা হলো। পোস্টমাস্টার জেনারেল ভদ্রতাসহকারে বললেন যে, ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি অনুসন্ধান করে চিঠিখানা পাওয়া গেল কিনা জানাবেন। একঘণ্টা বাদে টেলিফোন বেজে উঠলো। পোস্টমাস্টার জানালেন যে চিঠিখানা পাওয়া গিয়েছে এবং যদি পত্রপ্রেরক ইচ্ছা করেন তবে তিনি নিজেই এক শিলিং টিকিট লাগিয়ে চিঠিখানা

যথাস্থানে সেইদিনই পাঠাবার ব্যবস্থা করতে রাজী আছেন। বলাবাহুল্য পত্রপ্রেরক তার পরদিন বহু ধন্যবাদান্তে পোস্টমাস্টার জেনারেলকে টিকিটের দাম এক শিলিং দিয়ে এসেছিলেন।

আর একদিনের ঘটনা। ভারতগামী জাহাজ এডিল্যাড বন্দরে ভিড়লে পর, বারো মাইল দূরবর্তী শহরটি দেখবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। জাহাজঘাটা থেকে ট্রেনে বরাবর এডিল্যাড শহরে যাওয়া যায়। প্রায় সারাটা দিনই এডিল্যাড ঘুরে বেড়ালাম। বিকেলের ট্রেনে ফিরবার পথে গ্রাউণ্ডভিল স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হলো। গাড়ি বদল করবার সময় মাথার উপরের বাংকে রক্ষিত ফেল্ট-হ্যাটের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে হ্যাটবিহীন অবস্থায় জাহাজে ফিরে এলাম। হ্যাটের কথা মনে পড়লো প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে।

"টুপি আমার হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ভাইরে,
তার বিহনে মনে আমার কত ব্যথা পাইরে।"

ওটাকে যে ফিরে পাব সে আশা ছেড়েই দিলাম, তবুও একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ছুটে গেলাম স্টেশন মাস্টারের কাছে। ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো এবিষয়ে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে একটা সাফ জবাব দেবেন। কিন্তু তা না করে তিনি আমার কথা শুনে তক্ষণি টেলিফোনে গ্রাউণ্ডভিল স্টেশনের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলেন। সেখান থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে এডিল্যাড স্টেশনের সহিত যোগ স্থাপন করলেন এবং আমার নাম ও জাহাজের কেবিন নম্বর ইত্যাদি টুকে নিয়ে বললেন যে ঘণ্টা দুই বাদে হ্যাটের কোন হদিশ মিললো কিনা জানাবেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। জাহাজ ছাড়বে রাত বারোটায়। খুব বেশী অপেক্ষা করতে হয় নি, রাত্রের ডিনারের পর কেবিনে ফিরে এসে দেখি হ্যাট সমেত একখানা ছোট্ট লিপি টেবিলে কেউ রেখে গিয়েছে। স্টেশন মাস্টার হারানো টুপিটা

ফেরত পাঠিয়ে শুভ যাত্রা কামনা করেছেন। বিদেশী ও অপরিচিত ভদ্র-লোকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, আমার দেশের কোন স্টেশন মাস্টার তাঁর স্বজাতির কোন যাত্রীর জন্য এতটা করতেন কিনা জানি না। জাহাজের টেলিফোনে ভদ্রলোককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা ছাড়া আর বেশী কিছু করবার আমার অবকাশ ছিল না। এমনিতর ছোটখাট অনেক ব্যাপারেই এদের জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। •

জাতীয় মণীষার দিক দিয়ে বিচার করলে অস্টেলিয়ানদের মাঝারি-গোছের বা mediocre ছাড়া বেশী কিছু বলা যায় না। শিক্ষিতের হার শতকরা ৯৮।৯৯ এবং সে সমাচার নানা ভাবেই এরা ফলাও করে বলে, আর একথাও সত্যি যে ছয় বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে ১৪।১৫ বছর বয়স অবধি প্রতিটি বালক-বালিকার বিনা খরচে শিক্ষার সার্বজনীন ব্যবস্থা অতি সুচারুভাবেই করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষাধারা হচ্ছে গতানুগতিক ইংরাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার হুবহু অনুকরণ—এর ভিতর দিয়ে কোন একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ গড়ে তোলবার প্রয়াস নেই। একদিকে নেই কোন প্রাচীন ও ইতিহাস-সমর্থিত ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপট ও অপরদিকে নেই কোন নূতন সৃজনাত্মক প্রচেষ্টা। আদর্শ-বিহীন শিক্ষাধারা শতকরা নিরানব্বই জন লোককে সাক্ষর (literate) করে তুলতে পারে, কিন্তু প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা করতে পারে না। অস্ট্রেলিয়ায় স্বাক্ষর বা লিটারেট প্রায় সবাই। দৈনিকখবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা ও জনপ্রিয় সাহিত্য—যার মাধ্যমে জাতীয় দৃষ্টিভংগী ও জাতীয় মনীষা অহরহ প্রতিফলিত হয়—সেটা খুব উচ্চাঙ্গের নয়। খবরের কাগজের পাতা খুললে চোখে পড়বে ঘোড় দৌড়, বিবাহ, ডাইভোর্স বা তৎজাতীয় হাল্কা সংবাদ। বিভিন্ন খবরের কাগজের স্তম্ভ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ভারতীয় কোন সংবাদ চোখে পড়ে নি। এশিয়া, ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইংলণ্ড বাদে জগতের অন্য যে কোন দেশ

সম্বন্ধেই এদের জ্ঞানের সংকীর্ণতা মারাত্মক। ডাঃ পিটার রাসো (Dr. Peter Russo) মেলবোর্ণের 'Argos' নামক দৈনিক পত্রিকার পররাস্ট্র-সম্পাদক। বৈদেশিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে খুব ওয়াকিফ্‌হাল বলে এঁর কিছুটা খ্যাতি আছে। একদিন এক ছোট্ট সভায় এঁর বক্তৃতা হলো। বক্তৃতার বিষয়—অস্ট্রেলিয়া ও প্রাচ্য দেশ সমূহ। ভদ্রলোকের কথায় মনে হলো তিনি তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি সম্বন্ধে খুব সচেতন, খানিকটা গর্বিতও বটে। কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান দেখলাম "হিতোপদেশ" ও "পঞ্চতন্ত্র" নামক দুখানা গ্রন্থের ইংরেজী তর্জমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি নাকি শ্রীজওহরলাল নেহেরু আর পরলোকগত লিয়াকৎ আলীর সঙ্গেও দেখা করেছেন। ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার দুজনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন যে, জওহরলাল নেহেরু চান যে পাকিস্তান যত শীঘ্র আবার ভারতের সঙ্গে মিলিত হয় ততই মঙ্গল, আর নেহেরু নাকি সেই স্বপ্নই দেখেন। কিন্তু লিয়াকৎ আলী পাকিস্তানের রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্যে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং ভারত বিভাগকে তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলেই গ্রহণ করেছেন। এই অমূল্য আবিষ্কারের জন্য ভদ্রলোক কষ্ট করে এতদূর না এলেও পারতেন, এবং তাঁর অভিমত জানতে পারলে যে শ্রীনেহেরু পুলকিত হবেন না একথা নিঃসন্দেহ। আসল কথা হচ্ছে ইংরাজের বশম্বদ অস্ট্রেলিয়ান এবং অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের পাকিস্তান প্রীতি সুবিদিত ও সুস্পষ্ট। বহু অস্ট্রেলিয়ান প্রথমে আমাকে পাকিস্তানী বলে সাদর সম্ভাষণ করেছে এবং লক্ষ্য করে দেখেছি যে পরে পাকিস্তানী নয় জেনে যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে। ইংরাজ ও শ্বেতাঙ্গদের পাকিস্তান প্রীতির কারণ সর্বজনবিদিত।

জীবনধারণের মান এদের উঁচু। দৈনন্দিন জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্যের অভাব নেই। বর্তমান জগতের কোন দেশের তুলনায়

(অবশ্য আমেরিকা বাদে) এদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অধিকতর। মাথা পিছু সর্বনিম্ন আয় সপ্তাহে গড়ে দশ পাউণ্ড। অস্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড ভারতীয় এগার টাকার সমান। তাহলে মাথা পিছু সর্বনিম্ন মাসিক আয় হলো প্রায় ৪৫০৲ টাকা। সর্বনিম্ন বেতনের তুলনায় সর্বোচ্চ বেতন খুব বেশী নয়—কুড়ি থেকে ২৫ পাউণ্ড হপ্তায়। এর ফলে এদের অর্থনৈতিক অবস্থায় বেশ একটা সমতা রয়েছে। এদের সমাজসেবা আইনের বিভিন্ন ধারায় আসন্নপ্রসবা মাতা, নবজাত শিশু, ষোলবৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর ভরণপোষণ, রোগ, দৈবদুর্ঘটনা, দৈহিক অক্ষমতা, বেকার জীবন, বার্ধক্য ও বৈধব্য ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থার প্রতিকার বা প্রতিষেধকল্পে সরকারী তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ রয়েছে। সব কিছু ব্যাপারেই এরা সরকার বা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী, শিক্ষা বা সমাজসেবা নিয়ে সাধারণ নাগরিক বা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান বড় একটা মাথা ঘামায় না।

আর্থিক স্বচ্ছলতা, বিলাসব্যসনের প্রাচুর্য এবং জীবনের সমস্যা ও সংগ্রামের অভাব,—মুখ্যত এই তিনটি কারণেই এরা অনেকটা আত্ম-তুষ্ট। সপ্তাহে পাঁচদিন মোট চল্লিশ ঘণ্টা এরা কাজ করে। বাকী দুদিন পূর্ণ বিশ্রাম। অস্ট্রেলিয়ায় শনিবার আর রবিবার বড়ই একঘেয়ে—বিশেষ করে বিদেশীর কাছে। আফিস আদালত, পোস্টআফিস, দোকান পাট, সিনেমা-থিয়েটার এমন কি কাফে, রেস্তরাঁ প্রভৃতি সবই সে দুদিন ছুটি। অস্ট্রেলিয়ানরা এ দুদিন হয় কাপড়কাচা, ইস্ত্রি করা, গৃহ সংমার্জন বা উদ্যান রচনা করবে, অথবা মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়বে ফুর্তির খোঁজে। বাড়িতে চাকর চাকরাণীর বালাই নেই। কাজের তুলনায় কারিগরের অভাব। সে অভাব অবশ্য অনেক-কাংশেই এরা যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সাহায্যে দূর করেছে। সরকারী ও বেসরকারী আফিসগুলিতেও দেখেছি আমাদের দেশর আফিসের মতো

আর্দালি পিওনের ছড়াছড়ি নেই। অফিসারেরা নিজেরাই ফাইল বহন করছেন, নিজেদের ডেস্ক-টেবিল ঝেড়ে পুছে সাফ করছেন, আর নিজের হাতেই চা তৈরি করছেন এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে আগন্তুককে পরিবেশন করছেন। আবার চা পানান্তে নিজেরাই চায়ের পেয়ালা ধুয়ে মুছে রাখছেন।

অনেক ভদ্রলোকের বাড়িতে আহারে আমন্ত্রিত হয়ে প্রথম প্রথম বড়ই বিব্রত বোধ করতাম—আহারান্তে যখন গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী নিজ হাতে এটো বাসন ধতে শুরু করতেন। শেষে প্রায়ই may I lend a hand too, আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কি—বলে বাসন ধোয়ায় লেগে যেতাম।

আফিসে আদালতে অটোমেটিক লিফট্ বা এস্কেলেটর (escalator)—লিফট্ম্যানের প্রয়োজন নেই। পোস্ট আফিসের stamp-kioskএ নির্দিষ্ট ছিদ্রপথে মুদ্রা নিক্ষেপ করলেই স্ট্যাম্প বেরিয়ে আসবে। সাধারণের মলমূত্রাগারের প্রবেশদ্বারেও অনুরূপ ব্যবস্থা। যন্ত্রের সাহায্যে এমিতর বহুক্ষেত্রেই মানুষের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। দেশে বেকার সমস্যা তো নেইই, পরন্তু সর্বত্র কর্ম-খালির বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি।

হপ্তায় চল্লিশঘণ্টা কাজ—তাও যেন এদের কাছে অতিরিক্ত। ট্রেডইউনিয়নগুলি চল্লিশ ঘণ্টাকে কমিয়ে পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা করার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে।

সমুদ্র-পথ

১৯৫২ সনের ২৮শে মার্চ, শুক্রবার। বেলা চারটায় সিডনি বন্দর থেকে পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানীর স্ট্রেথেয়ার্ড (Strathaired) জাহাজে

ভারতাভিমুখে রওনা হলাম। জাহাজ ছাড়লো কাঁটায় কাঁটায় চারটায়। জাহাজ ছাড়বার বহু আগে থেকেই পিয়ারমণ্ট (Piermount) জেটি লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিলো। জাহাজের যাত্রী হবে এগারোশ, মাঝিমাল্লা ও কর্মচারী আরও পাঁচশ। যাত্রীদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে দু তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়েছিলো। দোতলা জেটির উপর দাঁড়িয়ে যাঁরা বিদায় দিতে এসেছেন তাঁরা অনেকে জাহাজের দিকে রঙীণ কাগজের শিকল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন, আর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বিদায়ী বন্ধু ও প্রিয়জন সেইগুলি লুফে লুফে ধরছেন। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, বেগ্নি কাগজের শিকলে তীর ও তরঙ্গের ব্যবধান ঘুচিয়ে আসন্ন বিচ্ছেদকে বিলম্বিত করবার নিষ্ফল প্রয়াস। অনভিপ্রেত ভবিতব্যকে শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়াই বোধ হয় মানুষের স্বভাব। ধীরে ধীরে মাটির মায়া কাটিয়ে বিরাটবপু জাহাজখানা গতি-চঞ্চল হয়ে উঠলো। জেটিতে দাঁড়িয়ে অগণিত নরনারী হাত নেড়ে, রুমাল উড়িয়ে বিদায় জ্ঞাপন করতে লাগলো। ক্ষণ-ভঙ্গুর কাগজের শিকলগুলি অপসৃয়মান জাহাজের আকর্ষণে খসখস শব্দে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ছে। জাহাজ ক্রমেই জেটি ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে। দ্রুত তালে জাহাজের ব্যাণ্ড বেজে উঠলো।

মোদের যাত্রা হল শুরু— ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার,
এবার তুফান উঠুক বাতাস ছুটুক
ফিরব নাক আর।

এদিকে জাহাজের যাত্রীদল—বেশীর ভাগই শ্বেতাঙ্গ—যাত্রা-পর্ব উদ্‌যাপন করছে আকণ্ঠ সুরাপানে। দলে দলে নরনারী সুরার বোতল শূন্য করে জাহাজ থেকে জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে—আর সেই বোতল-

গুলি খাড়াভাবে জলে ভাসছে। উপসাগরের দুইতীরে সুদৃশ্য সিডনি শহর যেন হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে। কিন্তু অকারণ এই পেছনের ডাক—নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পেছন-ফেরা।

পশ্চিম দিগন্তে সিন্ধুপাড়ে সূর্যদেব অস্তাচল গমনোদ্যোগী। সন্ধ্যার অস্তরাগে সারা আকাশ ও পুঞ্জীভূত মেঘ নানা বর্ণে বৈচিত্র্যময়, দূর আকাশের গায়ে বলাকাবদ্ধ বিহঙ্গদল কোন্ সুদূরের যাত্রী। দলে দলে বুভুক্ষু সীগাল্ (Sea gull) জাহাজের আশে পাশে উড়ছে। তাদের কাকলী ধ্বনিতে সমুদ্রবক্ষ মুখর। সিড্‌নির শেষ দৃশ্য—বিখ্যাত সিড্‌নি হারবার ও ব্রীজ, ক্রমে আসন্ন গোধূলির আবছায়ায় পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পাইলট জাহাজ সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত এসে বিদায় নিয়ে আবার বন্দরে ফিরে গেলো। সম্মুখে অনন্ত-বিস্তার সুনীল জলধি। ডেকে দাঁড়িয়ে দু চোখ ভরে অসীমের এই বিরাট রূপকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলাম।

কোথা তার তল, কোথা কূল।
বলো কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার
অপার ব্যাকুলতা,
তা'র সুগভীর মৌন, তা'র
সমুচ্ছল কলকথা,
তা'র হাস্য, তার অশ্রুরাশি।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ ও সমুদ্র আচ্ছন্ন হয়ে এলো। একটি দুটি করে তারায় তারায় নীল গগন ভরে গেলো। জাহাজের গতি এতক্ষণে প্রবল হয়ে উঠেছে। একটানা ইঞ্জিনের ঝাঁ। ঝাঁ গর্জন।

জাহাজের গতিবেগে সমুদ্রের জল দুভাগে ভাগ হয়ে প্রবল ফেনোচ্ছ্বাসে দু'পাশে ভেঙ্গে পড়ছে।

তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি'
হেসে হল কুটি কুটি।

দুর্নিবার বেগে সিন্ধু-বক্ষ মথিত করে জাহাজ চলেছে। দূরে অস্ট্রেলিয়ার তটরেখার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে হেথা-হোথা বিক্ষিপ্ত লাইট-হাউস বা আলোক স্তম্ভগুলি।

সিডনি থেকে রওনা হয়ে প্রথম তিনদিন বেশ আরামে কাটান গেলো। অনেকেই সঙ্গে ট্র্যাভল টেবলেট (Travel tablets) নিয়ে এসেছিলেন এবং পাছে সমুদ্র-পীড়া হয়, সেই ভয়ে দুচারটে ট্যাবলেট আগেই খেয়ে নিয়েছেন। আমি কোন ট্যাবলেট খাই নি। সমুদ্র-পীড়া যদি একান্তই হয়, তা হবে। প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকবো। দেখা যাক কি হয়। জাহাজ মেলবোর্ণ বন্দরে তিন দিন নোঙর ফেলে থাকলো। মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলভাগ প্রায় সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে অস্ট্রেলিয়ার শেষ বন্দর ফ্রিম্যাণ্টল থেকে জাহাজ ভারত-সমুদ্রে পাড়ি জমাবে কলম্বো অভিমুখে। মেলবোর্ণ ছাড়ার পর গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান বাইট (Great Australian Bight) অতিক্রম করবার পালা। অস্ট্রেলিয়ান বাইটের বদনাম নাকি বে অব্ বিস্কের (Bay of Biscay) চাইতেও বেশী। একজন সহযাত্রী গল্প করলেন যে একবার এই বাইট অতিক্রম করবার সময় সমুদ্রের এতই ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিলো যে, তিন দিন কোন যাত্রীই কেবিনের বাইরে আসতে পারে নি। একশ দশফিট উঁচু ঢেউ জাহাজের ডেকের উপর দিয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। জাহাজখানা নাকি মাতালের মতো জলে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। আমাদের সৌভাগ্য বাইটের এ রুদ্ররূপ দেখতে হয় নি। তাও যেটুকু হয়েছিল তারই ফলে আমাকে একদিন কেবিনে শুয়ে থাকতে

হলো। অনেক যাত্রীরই এই অবস্থা। সমুদ্রপীড়ায় সারাদিন বমনেচ্ছা ও মাথাঘোরা চললো। আহার্য ও পানীয় কোনটাই গ্রহণ করা গেলো না। কেউ কেউ উপদেশ দিলেন উঠে খোলা ডেকে হেঁটে বেড়াতে "to develop the sea-leg" অর্থাৎ সমুদ্র পীড়াকে সহজ বা স্বাভাবিক করে নিতে। কিন্তু আমার ভয় সী-লেগ ডেভেলপ করতে গিয়ে যদি সবার সামনে বমন আরম্ভ হয়, তবে সে অবস্থাটা হবে বড়ই অবাঞ্ছনীয়, কাজেই বন্ধুদের উপদেশ গ্রহণ না করে কেবিনেই শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। ফল হল ভালই। পরদিন বেশ সুস্থ বোধ করলাম, যদিও বাইটের উত্তাল তরঙ্গে জাহাজের গতি তখনো টলটলায়মান।

এর পর আর সমুদ্রপীড়া বিন্দুমাত্রও অনুভব করি নি। আমি পূর্ব বঙ্গের লোক। মাদারীপুরে থাকাকালীন সরকারী চাকুরির দায়ে তিনবৎসর নদী আর খালে বিলে বহুদিন নৌকায় নৌকায় কাটিয়েছি। ভেবেছিলাম যখন কোনদিন river sickness-এ ভুগি নি, তখন Sea-sickness ও বোধ হয় আমার হবে না। কিন্তু মহাসমুদ্র মাদারীপুরের তুচ্ছ অভিজ্ঞতাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। তার পরাক্রমের একটু মৃদুস্পর্শমাত্র দিয়ে গেলো—আর তাতেই আমরা প্রায় কাবু। দক্ষিণ সমুদ্র হতে প্রবাহিত তুষার-শীতল বায়ু অস্ট্রেলিয়ান বাইটের জলরাশিকে উদ্বেলিত করে তোলে। বিশাল ফেনশীর্ষ তরঙ্গের দোলায় এতো বড় জাহাজটি মোচার খোলার মতো নাচতে থাকে—আর সেই নর্তনের তাণ্ডবে ক্ষীণপ্রাণ মানুষের হয় মরণদশা।

যাহোক, এযাত্রা অল্পের উপর দিয়েই ফাঁড়া কাটলো। পর পর মেলবোর্ণ, অ্যাডিলেড ও ফ্রি ম্যাণ্টল বন্দর ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগার দিনের দিন আমাদের জাহাজ উত্তর পশ্চিম মুখে ভারত মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাল। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল সিংহল দ্বীপের রাজধানী কলম্বো বন্দর। পুরো সাত দিন সাত রাত অবিরাম চলার পর কলম্বো বন্দরে পৌছান

যাবে। মাঝে পড়বে বিষুব রেখা। বিষুব রেখা অতিক্রম করার সময় প্রাচীন প্রথানুযায়ী জাহাজের নাবিকেরা বরুণ দেবতার (King Neptune) প্রতি সম্মান দেখাল নৃত্যগীতে ও সং তামাসার অনুষ্ঠান করে। জাহাজের কাপ্তেন বিষুবরেখা অতিক্রম করার নিদর্শনরূপে আমাকে তার স্বাক্ষরযুক্ত একখানা অভিজ্ঞানপত্র দিলেন। নীচে সেই সার্টিফিকেটের অবিকল অনুলিপি তুলে দেওয়া হলো :—

This is to certify that Mr. N. Roy on board "Strathaird" has been duly initiated as a Son of Neptune according to the ancient rites and ceremonies existing from time immemorial.

I hereby grant him Freedom of the Seas and charge all kippers, haddocks and other denizens of the deep from molesting him in any way should he fall overboard. Given under our Hand on the Equator.

Henry S. Allan

By Command of His Majesty
King Neptune
Lord of the Seas, Sovereign of all Oceans
Ruler of the Waves.

জাহাজের যাত্রীরা প্রায় সবাই স্ফূর্তিবাজ ও আমুদে লোক। বেশীর ভাগই শ্বেতাঙ্গ, জনকয়েক সিংহলী, আর আমরা চারজন ভারতীয়। আমাদের চারজনের একজন—চন্দ্রামশায় দু দিনেই অপর স্ফূর্তিবাজদের দলে ভিড়ে পড়লেন। অনেক অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক ও মহিলা ৩-৪ মাসের ছুটিতে ইংলণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছেন। ভাবটা—

Oh ! to be in England,
Now that April's there.

ইংলণ্ডে এখন রমণীয় বসন্ত কাল, আর অস্ট্রেলিয়ায় এখন শীত পড়ি পড়ি করছে। এদের ফন্দিটা মন্দ নয়। অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে ইংলণ্ডে চললেন বসন্তকাল উপভোগ করতে, আবার সেখানের উষ্ণ মাস-গুলি উপভোগ করে যখন ফিরবেন তখন অস্ট্রেলিয়ায় শীত অপগত হয়ে গ্রীষ্মের সমাগম হয়েছে। শীতের জুজুকে ফাঁকি দেওয়ার বেশ ফিকির! বারমাসে তিন বসন্ত!

বাইশ হাজার টনের যাত্রী জাহাজ। নির্মাতারা যাত্রীদের আরাম আয়েসের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি করেন নি। সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা। সেবাপরায়ণ ও ভদ্র পরিচায়ক সর্বদাই যাত্রী-দের নানা ফাই ফরমাস খাটছে। স্নান, আহার, ভ্রমণ, খেলাধূলা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন, চলচ্চিত্র, বলনাচ, সাঁতার ও প্রচুর মদ—যার যেরকম অভিরুচি সে সেই ভাবেই সময় কাটাতে পারে। আমাদের চন্দ্রামশায় বলনাচ ও অন্য অনেক রকমের ফুর্তি নিয়ে খুব মেতে উঠলেন। যাত্রী-দের মধ্যে মহিলার সংখ্যাও প্রচুর। যাঁরা বর্ষীয়সী তাঁরা প্রায়ই সেলাই বা উলবুনন নিয়ে ব্যস্ত, অথবা খোলা ডেকে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিদ্রিত। বুড়োরা খুব ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা প্রায় সকলেই বেশ আলাপী। অনেক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হলো, কেউ বা পার্লামেণ্টের-(অস্ট্রেলিয়ান) সদস্য, কেউ আইনজীবী, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষাব্রতী ইত্যাদি। ইংলণ্ডে যাচ্ছেন অবকাশ-বিনোদনের জন্য। আর যাঁরা খাস ইংরাজ তাঁরা যাচ্ছেন স্বদেশে। সামাজিকতা এঁদের চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ। যেচে এসে আলাপ করবে। দেখা হলেই অভিবাদন করবে—কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

যাত্রীদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সী তাদের চালচলন আবার অন্য ধরনের। যুবক যুবতীর দল জোড়ায় জোড়ায় ফুর্তির

খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মদ্য-পানের পরিমাণ দেখে অবাক হতে হয়! এক আসনে বসে একটানা ৬।৭ ঘণ্টা মদ খেয়ে যাচ্ছে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে একত্র স্নান বা ডেক টেনিস ইত্যাদি নিয়ে একদল মত্ত। কেউ কেউ আবার ডেকের কোন এক নিভৃত কোণে বিশ্রাম্ভালাপে মগ্ন। তরুণীর দল সকাল সন্ধ্যা অত্যন্ত হ্রস্ব জাঙ্গিয়া এবং এক খণ্ড সংকীর্ণ বক্ষাবরণ পরিহিতা হয়ে অপরূপ মূর্তিতে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেজায় নাকি গরম! কিন্তু সারাদিনের বেহায়াপনার শোধ তুলে নেবে সন্ধ্যাবেলা ডিনারের সময়। পুরুষের বেলায় ডিনার স্যুট সাদা সার্টের উপর কালো বো-টাই ও কালো কোট, আর মেয়েদের বেলায় আপাদলম্বিত গাউন—এই হচ্ছে অনুমোদিত ডিনার স্যুট। এ না পরে ডিনারে গেলে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

আমার ডিনার টেবিলে বসতো এক সিংহলী ছোকরা। তিন বৎসর অস্ট্রেলিয়ায় থেকে লেখাপড়া বিশেষ কিছু না শিখলেও আদব-কায়দা আর মদ্যপান এ দুটো জিনিসে খুব রপ্ত হয়ে এসেছে। খুব ফলাও করে তার সাহেবীয়ানার গল্প করতো। ছোকরার নাম সুখলিঙ্গম, সিংহলের কোন সরকারী স্কুলের শিক্ষক। ছোকরা যে পরিমাণ মদ খেতে শিখেছে তাতে মাস্টারীর চাকুরি নিয়ে তার দিন চলা ভার হবে। সিংহলের আরও জনকয়েক ছাত্র ও সরকারী কর্মচারীর সঙ্গেও অস্ট্রেলিয়ায় আলাপ পরিচয় হয়েছিলো। আশ্চর্যের বিষয় এরা সবাই পানীয় ব্যাপারে খুব উদারনৈতিক ও অগ্রগামী। ইংরাজের ভাল গুণ বেশী কিছু গ্রহণ করতে না পারলেও, ইংরাজের দোষ অনেকটাই পেয়েছে।

মাওরি মুলুকে

খুব ছোটবেলায় পড়া রূপকথার মাওরি-রাজ্য! কোন দূর নীল সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট দ্বীপটি যার পাখি-ডাকা

স্নিগ্ধ বনভূমি আর ধূমেল পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে-আসা রূপালী ঝর্ণা-ধারা কল্পনায় জাগিয়ে তুলতো শিশু মনের অদম্য কৌতূহল! কোথায় সেই সুন্দর, স্বপ্নময় দেশ! না জানি কেমন সে দেশের লোকগুলি, যারা পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে অবাধ বিচরণ করে আর সাগর-তরঙ্গে ভাসিয়ে দেয় তাদের ভেলা,—ভেসে যায় দিক্‌হীন অথৈ দরিয়ায়,—যাপন করে এক নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ, সহজ, শান্ত, আদিম আরণ্য-জীবন!

শৈশব স্বপ্নরহস্যের ঘোর কেটে যায় প্রাপ্ত বয়সের কর্তব্যের তাগাদায়। ভূগোলের পাঠ আদায় করে নেন মাস্টার মশায়। পরীক্ষার গরজে আয়ত্ত করতে হয় নানা দেশের ভৌগোলিক বিবরণ। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ নিউজিল্যাণ্ড, পরস্পর সন্নিহিত দুইটি বৃহৎ দ্বীপ, আয়তন ১,০৪,১৭০, বর্গমাইল, রাজধানী ওয়েলিংটন শহর। এই হচ্ছে মাওরি মুলুকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীদের নাম মাওরি। মাওরিদের হাত থেকেই সুদূর শ্বেতদ্বীপবাসীরা এই দেশ কেড়ে নিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক,—খৃষ্টীয় সপ্তদশ—অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। এর কথা পরে হবে।

প্রায় হাজার বৎসর আগের কথা। ভারতবর্ষে তখন হিন্দুযুগের অন্তিম দশা। পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত জয়ধ্বজাবাহী বিধর্মী অভিযানকারীর দল মুহুর্মুহুঃ ভারতের দ্বারপ্রান্তে প্রচণ্ড আঘাত হানছে। সেই আঘাতের প্রচণ্ডতায় ঐক্যহীন হিন্দুরাষ্ট্র-শক্তির পতনোন্মুখ অবস্থা। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মির মত উত্তর ভারত ও বঙ্গদেশ তখনও সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের কীর্তি-মহিমায় সমুজ্জ্বল। রাজপ্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি জয়দেব-হলায়ুধ-জীমূতবাহন প্রমুখ মনীষী এক নূতন সংস্কৃতিধারা রচনা করেছেন। অন্যদিকে ইউরোপ ভূখণ্ডে তখন ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের আমল। ইংলণ্ডে রাজা অ্যালফ্রেডের

উত্তরাধিকারিগণ দুর্ধর্ষ ভাইকিং (Viking) আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত।

সেই সুদূর অতীতে খৃষ্টীয় দশম শতকের একসময়ে এক দুঃসাহসী অজ্ঞাতকুলশীল নাবিক অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমাচ্ছিলো। তার নাম কুপে (Kupe)। তার চারদিকে সমূহ বিপদ। প্রতিকূল বাত্যাবিতাড়িত হয়ে অচেনা অজানা সমুদ্রে দিশাহারা ভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন আমেরিকা আবিষ্কারক কলম্বসের মতোই সে দূর দিকচক্রবালে অস্পষ্ট মসিকৃষ্ণ উপকূল রেখা দেখতে পেলো। কুপে আর তাঁর নির্ভীক সহ-নাবিকগণের বাহন ছিলো কাঠের তৈরী, ছাদখোলা ও বৈঠাচালিত ডিঙ্গি নৌকা। অনেকটাই সেই ভাইকিং-এর (viking) মতো। কুপের দল সে নতুন দেশের নাম দিলো এওটিয়ারোয়া (Aotearoa)। এই অভিযান-কারীর দল কারা এবং কোথা থেকে এরা এলো তার সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য এখন আর জানবার কোন উপায় নেই। মাওরি কিংবদন্তী বলে, পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ থেকে কুপের দল নূতন দেশের খোঁজে বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই দ্বীপে এসে হাজির হয়। মাওরি ঐতি-হাসিক তে রাংগি হিরোয়া (Te Rangi Hiroa), যাঁর খৃষ্টান নাম Sir Peter Buck এই কিংবদন্তীর সত্যতা সমর্থন করেন। কুপে এবং তার দলীয় লোকেরাই মাওরিদের পূর্বপুরুষ,—পলিনেশীয়, মেলানেশীয় এবং মাইক্রনেশীয় গোষ্ঠীর শাখা বিশেষ। অনুমান করা যেতে পারে যে, কোন অজ্ঞাত সময়ে দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হয়ে এরা নিজেদের আদি বাসভূমি পরিত্যাগ করে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে অসীম সমুদ্রে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো। সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার ফল হলো এওটিয়া-রোয়া আবিষ্কার। কুপে কিন্তু এই নতুন দেশে স্থায়ী বাসা বাঁধেন নি। তাঁর রক্তে ছিল লোনা জলের নেশা। তাই কিছুদিন বাদে আবার তিনি মত্ত সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে দিলেন। কুপের অভিযান কোন স্থায়ী ঔপনি-বেশিক অভিযানে পরিণত না হলেও মাওরি মহলে যে কিংবদন্তীর সৃষ্টি

হয়েছিলো তারই প্রত্যক্ষ ফল ফলেছিলো আরও দুই শত বৎসর পরে। মাওরি কিংবদন্তী অনুসারে নিউজিল্যাণ্ডে প্রথম মাওরি ঔপনিবেশিক অভিযানকারীর দল এসেছিলো এক বিরাট নৌবহর নিয়ে, যাকে বলা হয় The Grand Fleet। এই গ্র্যাণ্ড ফ্লিট অবশ্য ছিলো মাত্র বারখানা canoe বা কাঠের ডিঙ্গির সমষ্টি। গ্রাণ্ড ফ্লিটের নিউজিল্যাণ্ড আগমন মাওরি ইতিহাসের এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সেই বিগত বিস্মৃত-প্রায় ঘটনা অবলম্বনেই গড়ে উঠেছে মাওরি রূপকথা ও মাওরি ঐতিহ্যের ধারা। স্যার পিটার বাকের মতে গ্র্যাণ্ড ফ্লিটের আগমন হয়েছিলো খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি। তারপর দীর্ঘ সাত আটশো বৎসর এই দ্বীপে আর কোন নতুন আগন্তুকের আবির্ভাব হয় নি। বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই সাত-আটশো বৎসরে মাওরির জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবার কারণ দেখা যায় নি। অষ্টাদশ শতকে যখন এই অজ্ঞাত দ্বীপে শ্বেতাঙ্গ অভিযানকারীর প্রথম আবির্ভাব হলো তখনও মাওরি সেই সাবেকি প্রণালীতেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে আসছিলো। মাওরি জানতো আগুনের ব্যবহার, কিন্তু জানতো না ধাতু-দ্রব্য ব্যবহার করতে। জমি চাষ করতো ও কাঠ কাটতো পাথরের হাতি-য়ারের সাহায্যে। আহার্য ছিলো গাছের ফলমূল, বনের পাখির মাংস, নদী ও সমুদ্রের মাছ। নিউজিল্যাণ্ডের অধুনা-বিলুপ্ত পৃথিবীর বৃহত্তম পাখি মোয়া (Moa) ছিলো আদিম মাওরির প্রিয় শিকার। কার্পাস বস্ত্রের চলন ছিলো না। ফ্লাক্স (Flax) বা শণজাতীয় জিনিসের তৈরী অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যময় আবরণে মেয়েরা লজ্জা নিবারণ করতো। পুরুষদের পরিধেয় বসনও ঐ একই জিনিস। অনেক যোদ্ধা মাওরি হাঁটুর উপর সারা দেহ উল্কিতে সজ্জিত করতো। উল্কি-অঙ্কিত দেহ উলঙ্গ বলে মনে হতো না।

মাওরি জীবনে পরিবারবদ্ধ হয়ে বাস করাই ছিলো রীতি। পরি-

বারের আকার বৃদ্ধি পেয়ে গোষ্ঠী বা জ্ঞাতির সৃষ্টি হতো। 'জ্ঞাতি' (Gnati) এই কথাটা মাওরি ভাষাতেও আছে। মাওরি ভাষায় বহু শব্দই সংস্কৃতজ। ভাষাবিদেরা ও নৃতত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন যে এই সাদৃশ্যমূলক শব্দ সংস্কৃতভাষী প্রাচীন ভারতীয়দের সহিত মাওরি জাতির কোন রক্ত-সম্বন্ধ নির্দেশ করে কিনা।

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখযোগ্য। নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর দ্বীপের প্রধান শহর অকল্যাণ্ডের অনতিদূরবর্তী তোরঙ্গাহোয়াই হোয়াই নামক মাওরি পল্লীতে গিয়েছিলাম। প্রত্যেক মাওরি পল্লীতেই থাকে খানিকটা খোলা জায়গা যার নাম মারে (Marae)। মাওরি সমাজ জীবনে মারে (Marae) এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধ, শান্তি বা তৎজাতীয় যে কোন সমস্যাই হউক, মাওরি এককভাবে সমাধানের চেষ্টা করে না। জ্ঞাতির সকলে একত্রে পবিত্র ভূমিতে সমবেত হয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত করাই মাওরি রীতি। শোক বা হর্ষ প্রকাশের স্থানও সেই। কোন আগন্তুককে সম্বর্ধনা জানাবার স্থানও সেই মারে। আমি বিদেশী তাতে ভারতীয়। আমার সম্বর্ধনার ব্যবস্থাও হলো সেইখানে। মাওরি নেতা মিঃ উনিয়াটা এবং মাওরি রাণী অশীতিবর্ষীয়া প্রিন্সেস্ তাপুই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধা তাপুই প্রথমেই এগিয়ে এসে প্রাচীন মাওরি প্রথায় আমার নাকে নাক ঘসে স্বাগত জানালেন। মিঃ উনিয়াটা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, মাওরি বিশ্বাস করে যে তাদের পূর্বপুরুষ ভারতীয় এবং আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ। ভারতের নেতা মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর উপর মাওরিদের অপরিসীম শ্রদ্ধা, কেননা, তারা মনে করে ভারতবর্ষই জগতের নিপীড়িত, উপদ্রুত ও বঞ্চিত জাতিপুঞ্জের অকপট বন্ধু ও ভরসাস্থল।

মাওরি পরিবার ও বৃহত্তর গোষ্ঠী বা জ্ঞাতির পরিচালনায় গোষ্ঠীপতির

দায়িত্ব ও মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। প্রাচীন আর্য সমাজের গোত্রপতির ন্যায় মাওরি দলপতিও বিশেষ ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী। গোষ্ঠী-পতির পদমর্যাদাকে বলা হয় মান (Mana)। মান শব্দটি সংস্কৃতজ, মাওরি ভাষায় এইরূপ আরও বহু শব্দ পাওয়া যায় যার সংস্কৃতজ মূল ভাষাতত্ত্ববিদগণের কৌতূহল উদ্রেক করবে।

মাওরি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। গৃহাঙ্গনে উন্মুক্ত সূর্যালোকে বাড়ির স্ত্রীপুরুষ সবাই একত্র হয়ে হাতে কোন কাজ নিয়ে বসবে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ভাবে বসে কাজও করবে আর অনর্গল আলোচনা করে যাবে। মাওরিরা খুব ভাল বক্তা। নিউজিল্যাণ্ডের বর্তমান পার্লামেণ্টে মাওরি সদস্যরাই নাকি শ্রেষ্ঠ বক্তা। পবিত্র সভাক্ষেত্রে (Marae) যে কোন বিশেস কারণেই জ্ঞাতি-সভা আহূত হয়ে থাকে। কখনো ক্রমান্বয়ে ছয়-সাত দিন ধরে এই সব আলোচনা সভার কাজ চলে। সভার কার্যবিবরণী এবং বক্তৃতাবলী যথারীতি লিপিবদ্ধ হয় না এবং সভাশেষে কোন বিশেস প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোটগ্রহণও করা হয় না। কিন্তু সভার অলিখিত সিদ্ধান্তই সকলে মেনে নেয়। এমন কি প্রস্তাবের প্রতি-কূলেও যারা মতপোষণ বা প্রকাশ করেছে তারাও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে না। এই গণতান্ত্রিক মনোভাব মাওরি চরিত্রের একটা প্রধান গুণ।

মাওরি স্বভাবতই যুদ্ধপ্রিয় জাতি। প্রাচীন কালে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতির মধ্যে অনবরতই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকতো। শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবার জন্য মাওরি জাতি সুরক্ষিত পা (Pa) বা পল্লীর অভ্যন্তরে ডাল-পালার তৈরী ঘরে বাস করতো। 'পা'-এর চারদিকে থাকতো মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির সুদৃঢ় আবেষ্টনী।

মাওরিদের ভোজ-উৎসবও ভারি সমারোহের ব্যাপার। বিবাহ,

যুদ্ধশান্তি, জ্ঞাতিসভা, বিশিষ্ট অতিথি সম্বর্ধনা ইত্যাদি উপলক্ষে ভোজের ধুমধাম লেগে যেতো। কাঠের তৈরী বিশাল মঞ্চে থরে থরে খাদ্যসামগ্রী সাজিয়ে রাখা হতো, আর আমন্ত্রিতগণ সেই খাদ্যসম্ভারের প্রাচুর্য দেখে উচ্চ কণ্ঠে তারিফ করতেন,—মাওরি সামাজিক প্রথার এ ছিলো এক বিশিষ্ট রীতি।

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণের আগমনের পূর্বে মাওরিদের আদিম জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জামের মধ্যে প্রধান ছিলো পাথরের তৈরী কুঠার ও বল্লম, শণের বা পাখির পালকের তৈরী পরিধেয়, বড় বড় মাছ ধরবার জাল, পাখি ধরার ফাঁদ, সবুজ পাথরের অলঙ্কার হেই টিকি (hei tiki) আর গাছ খোদাই ডিঙ্গি (canoe)। এই সম্বল নিয়েই প্রকৃতির কোলে, অরণ্য-পর্বতের নিরুদ্বেগ আশ্রয়ে বহু শত বৎসর এক অপরিবর্তিত ধারায় সনাতন মাওরি জীবন অতিবাহিত হয়ে আসছিলো। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে অতর্কিত এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেলো। দিগন্ত-প্রসারী নীলসমুদ্রের ওপার থেকে এলো পাল-বাহিত জাহাজে শ্বেতাঙ্গ অভিযানকারীর দল। এরা সঙ্গে নিয়ে এলো এক উৎসুক, উদ্যোগী ও সর্বগ্রাসী সভ্যতা। এই নতুন ও প্রবল শক্তির সংঘাতে মাওরি তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে কি? হয় তাকে এই বিজাতীয় সভ্যতা বর্জন করে স্বকীয়তা বজায় রাখতে হবে, নতুবা ওই নতুন প্রভাবে তাব আত্মবিলুপ্তি সুনিশ্চিত। প্রায় দেড়-শতাধিক বৎসরের শ্বেতাঙ্গ সংস্পর্শ ও প্রভাবে থেকে আজও পর্যন্ত মাওরির এই জীবনমরণ সমস্যার একটা শেষ মীমাংসা হয় নি।

পুনর্যাত্রা

এবার যখন ডাক পড়লো বাইরে যাবার, তখন আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। ২০শে মে, কলকাতার দারুণ গরম,—রাইটার্স বিল্ডিং-এর পায়রার খোপে বসে ফাইল মুক্ত করছি। পাঁচজন দর্শনার্থী সামনে বসে। বেলা তখন প্রায় পাঁচটা, কিন্তু কাজ মেলাই বাকী। এমন সময় টেলিফোনে সংবাদ এলো,—প্রস্তুত হও, দিন সাতেকের মধ্যেই দিল্লী হয়ে ডেনমার্ক যাত্রা করতে হবে। বিদেশ যাত্রা, বিশেষ করে সেটা যদি বিলেতমুখী হয়—একটা বড়ো রকমের সুযোগ! কিন্তু এর ঝামেলাও কম নয়! পাশ-পোর্ট, ভিসা, হেলথ্-সার্টিফিকেট, সাজ-পোশাক আর সর্বোপরি টাকাপয়সার যোগাড়, এসব মিলে এক এলাহী ব্যাপার। আমার মতো মানুষ, যার অগ্নভক্ষ্যধ্র্নুগু্ণঃ অবস্থা—তার পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু সরকারী হুকুম, তামিল করতেই হবে। তাই পড়ে গেলো হুড়োহুড়ি।

যদিও "লয়ে রসারসি করি কষাকষি পোঁটলাপুটুলি বাঁধি," এসবের দরকার হয় নি, এবং "বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে" গিন্নীও কেঁদে কেটে কোন অনর্থ বাধালেন না, কিন্তু সেই স্বল্প সাতদিনের মেয়াদে সব কিছু তৈরি করে নিতে প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে এলো। দিল্লীর কর্তারা টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করেই নিশ্চিন্ত। ৩০শে জুন দিল্লীর দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে; তারপর সেখান থেকে যথারীতি আদেশ ও উপদেশে রপ্ত হয়ে, হয় ১লা নয় ২রা জুন বিমানযোগে ডেনমার্ক যাত্রা করতে হবে।

২৯শে তারিখ রাত্রি সাড়ে আটটায় হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লী

মেলে রওনা হওয়া গেলো। সহযাত্রী দুইজন, বাণীপুর বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার আর হাওড়া সমাজ-শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীমন্মথনাথ রায়। পথে বর্ধমানে সঙ্গ নিলেন শ্রীনিকেতনের শ্রীতারকচন্দ্র ধর। হাওড়া স্টেশনে বিদায় দিতে এসে-ছিলেন অনেকেই,—বাবা, মা, শ্বশুর মহাশয় এবং শ্বাশুড়ী মহাশয়া। তা'ছাড়া গৌরী, সুষমা, অনু-ঝুনু, ও গোপাল। বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রহ্লাদবাবু ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কল্যাণী, অনিলরঞ্জন ও মমতা; আবার ওদিকে সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু ও বেঙ্গল পাবলিশার্সে'র শচীনবাবু।

হাওড়া গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে অনেক মালা এবং ফুলের গুচ্ছ উপহার পাওয়া গেলো। গাড়ি ছাড়বার সময় জানালা দিয়ে যতদূর দেখা যায় প্ল্যাটফরমের দিকে তাকিয়ে রইলুম। বাবা-মার চক্ষু অশ্রুসজল। গৌরীর দৃষ্টি করুণ, আর ছোট্ট গোপাল তার দাদুর কোলে থেকে আসন্ন বিচ্ছেদের আশংকায় যেন কিছুটা চঞ্চল। কৃষ্ণা দ্বাদশী রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে সগর্জনে ছুটে চলেছে দিল্লী মেল।

১লা জুন। সকাল সাড়ে দশটায় ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় দপ্তর-খানায় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের খাস কামরায় ডাক পড়লো। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে কিছু 'ইন্‌স্‌ট্রাক্‌শন্‌স্' বা উপদেশ গ্রহণের জন্য। মোট আঠারো জন যাত্রী,—এসেছেন ভারতের নানা মুলুক থেকে—কেউ সরকারী, কেউ আধা সরকারী, কেউ বেসরকারী—দুজন আবার ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য। শুভেচ্ছা এবং শুভযাত্রা কামনা করে আজাদ সাহেব যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন তার সার মর্ম হচ্ছে এই যে, যদিও বিদেশ থেকে বিশেষত ডেনমার্ক থেকে শিক্ষা বিষয়ে ভারতের গ্রহণ করবার উপযোগী তেমন কিছু জিনিস নেই, তবু তিনি আশা করেন যে বাইরের নানা

লোক ও প্রতিষ্ঠান দেখে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে, তা প্রত্যেকেরই কাজের পক্ষে হবে সাহায্যকারী। সে জন্যই তিনি খুব খুশী।

শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরের যুগ্ম-সচিব শ্রী কে. জি. সৈয়দেইন, স্পেশাল অফিসার ডাঃ ভান, শ্রী খান, সর্দার সোহন সিং এবং আরও উচ্চপদস্থ কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা গেলো। প্রায় সকলেরই মুখে এক কথা: "The Danish folk schools have arrested the exodus of the population from the villages to the towns."

কাজেই আমাদের ডেনমার্ক যাত্রার উদ্দেশ্য সে দেশের Rural Education বা পল্লী-শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করে ভারতীয় পল্লীর অবস্থানুযায়ী সেই নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন করা। কর্তৃপক্ষের মনোগত ভাব—বুনিয়াদী শিক্ষা বা Basic Education-এর কল্যাণে ভারতের মৃতপ্রায় গ্রামগুলিকে আবার প্রাণবন্ত করে তোলা, আর ক্রমবর্ধমান শহরমুখী জনস্রোতের গতি ব্যাহত করা। ডেনমার্কে এসে, ডেনমার্কের শহর ও পল্লী-অঞ্চলে বেড়িয়ে, এঁদের Folk High Schoolগুলি দেখে এবং এঁদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কিন্তু মনে হয় না যে এঁরাও সেই শহরাভিমুখী গতিকে রুদ্ধ বা মন্থর করতে পেরেছেন। সারা ডেনমার্কের জনসংখ্যা প্রায় ৪৩ লক্ষ। একুশ লক্ষ লোক শহরবাসী আর বাকী পল্লীবাসী। রাজধানী কোপেনহেগেন শহরেই দশ লক্ষের উপর লোক বাস করে। গত পঞ্চাশ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, যে হিসাবে শহরের অধিবাসী-সংখ্যা বাড়ছে সে অনুপাতে পল্লীঅধিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে না। এর মূলে রয়েছে যন্ত্র-সভ্যতা এবং যন্ত্রশিল্পের প্রসার। যন্ত্রপাতি একদিকে মানুষের কাজ কমিয়ে দেয়, আবার অন্য দিকে পল্লী-অঞ্চল থেকে কারখানা-অঞ্চলের দিকে মানুষকে টেনে আনে।

আর তারই ফলে পল্লীগুলি ক্রমশ জনহীন ও অনাদৃত হয়ে পড়ে আর শহরগুলি হতে থাকে জনবহুল ও স্ফীতকায়। আধুনিক সভ্যতার এই অনিবার্য পরিণামকে রোধ করবার কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। সারা জগৎ জুড়েই আজ যন্ত্র-সভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণ দেখা যাচ্ছে।

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা!"

কবির এ আকুল আহ্বানে নব সভ্যতা সাড়া দেবে না। শহরই হচ্ছে এই নব সভ্যতার প্রাণ। উপবনের স্নিগ্ধছায়ায় সংবর্ধিত আরণ্য সভ্যতার দিন ফুরিয়ে গেছে,—তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। গ্রামীন সভ্যতাকে ছাপিয়ে উঠেছে শহরের সভ্যতা। একে অস্বীকার করবার জো নাই। বাস্তবকে স্বীকার করাই সমীচীন। আজ হোক কাল হোক ভারতবর্ষকেও এই বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে। জোর করে শহরকে ঠেকিয়ে রেখে সভ্যতার স্বাভাবিক বিবর্তন বিলম্বিত করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যর্থ করা যাবে না। যারা মনে করেন আমাদের গরুর গাড়িই যথেষ্ট, মোটর গাড়ির দরকার নাই, তারা যেন স্মরণ রাখেন যে পীচঢালা পাকা সড়ক বানালেই গরুর গাড়ি ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাবে—তার স্থান অধিকার করবে জীপ ও মোটর ট্রাক, আর ইলেক্‌ট্রিসিটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের কাজ যাবে কমে। মানুষ সুবিধাবাদী। বিজ্ঞান ও যন্ত্র যে সুবিধা মানুষকে দিয়েছে তা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা যাবে কি?

সেই বিগত দিনের "পাখি ডাকা ছায়ায় ঢাকা" পল্লী কাব্যের উৎস হিসাবে অনবদ্য বিষয়বস্তু বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির তালে সেই পল্লীকেও তাল রেখে চলতে হবে। শিল্প বিপ্লবের

অব্যবহিত পরে এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে বহুলোক সমাবেশের ফলে ইংলণ্ডের গ্রামগুলিও সাময়িক ভাবে জনবিরল হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু শিক্ষাপ্রসার, যানবাহনের সুবিধা এবং সর্বোপরি ইংরাজ জাতির খেলাধূলার প্রতি মজ্জাগত আসক্তি এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তা—এই কতক-গুলি কারণে ইংলণ্ডে শহরাঞ্চল যেমন গড়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলিও হয়েছে সুন্দর এবং সুপরিকল্পিত। মোটামুটি বলা যেতে পারে ইংলণ্ডে এবং শুধু ইংলণ্ডে কেন ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই এরা গ্রামগুলিকে অতি যত্নে শহরের green belt বা শ্যামলাঞ্চলরূপে গড়ে তুলেছে। শহরে-বন্দরে মানুষ আসে কাজের তাগিদে কিন্তু গ্রামে ফিরে যায় বিশ্রামের খোঁজে। শহরের প্রাণ-চাঞ্চল্যের পিছনে রয়েছে পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ—শক্তির প্রকৃত উৎস। শহর যোগায় ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, গ্রাম যোগায় শক্তি ও সম্পদ। তাই আজকের দিনে জগতের চারদিকে দৃষ্টি রেখে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে এভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে শহরই যাবে গ্রামের দিকে এগিয়ে। অর্থাৎ গ্রামগুলিই ক্রমে ক্রমে হবে শহরের সহজ সংস্করণ, যেখানে মানুষ পাবে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও উপকরণ। এ ছাড়া অন্য গতি আর কি আছে ?

* * * *

২রা জুন বুধবার বিকেল সাড়ে ছটায় পালাম বিমান ঘাটি থেকে Air India International-এর Constellation বিমানপোতে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলাম। সহযাত্রী আঠারোজন এবং আরও অনেকে। আমরা আঠারোজন এসেছি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে। পশ্চিমবঙ্গের চারজন ও বিহারের চারজন, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যও প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন।

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের দেশ। এই আঠারো জনের বেশভূষা, ভাষা ও রুচির ভিতর দিয়েও সেই বৈচিত্র্যের বেশ খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ।

জাতীয় সঙ্গীতের জয় হউক! আমরা যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের বিচিত্র প্রতিভূ তাতে আর সন্দেহ কী! প্রথমেই ধরা যাক চারজন দেশোয়ালীর কথা। চারজনের চার রকমের পোশাক। একজনের মাথায় দেড়হাতি টিকি, কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, মালব্যজী ঢংয়ের শাদা পোশাক, হাতে এক কোঁৎকা লাঠি, মুখে বোকা বোকা হাসি। আর একজন আস্ত কুমড়োপটাশ—উদরসর্বস্ব দেহটির পটভূমিকায় ছোট্ট মাথা, ছোট্টতর চোখ, আর একজোড়া পালোয়ানী গোঁফ। আর দুজন আকারে ছোট হলেও বিক্রমে খাটো নয়। এঁদের কথা শুনে মনে হবে যেন একটা তুমুল 'কাইজা' চলছে। জিজ্ঞেস করলে বলবে, "আপোস্ মে এইস্যা হোতেই হ্যায়।" পুরা চারমাস এই চারজন বাকী চৌদ্দজনকে জিয়ীয়ে রেখেছিলো। যেখানে গিয়েছে সেখানেই বিদেশীরা এঁদের নিয়ে করেছে আমোদ, অনেকটা মানুষে সং দেখে যেমনটি করে। কিন্তু এঁদের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। নির্বিবাদে লেডিজ্ বাথরুমে ঢুকে পড়বে, দরজা বন্ধ করার সময় দড়াম দড়াম শব্দ হবে, স্নানাগারে করে আসবে জলপ্লাবন। ডিনার টেবিলে বসে সবগুলি ডিস নিজের কাছে টেনে আনবে, আর সব খাবার নিজের পাতে ঢেলে নেবে। অপর কারুর দিকে তাকাবার প্রয়োজন বা সময়—উভয়েরই অভাব। এঁরাই হচ্ছেন বহু-বিজ্ঞাপিত বুনিয়াদী শিক্ষার ধারক ও বাহক। বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। এঁরা মুখে হচ্ছেন গান্ধীবাদী কিন্তু আসলে সুবিধাবাদী। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁদের ধারণা যে

নিজের মুলুকই সারা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ থেকে আসছ কিনা,—জিজ্ঞাসা করলে বলবে, "নেহি—সে।" কোন ভারতীয় সমস্যার কথা উঠলে বলবে, "হম্‌লোগকে মুলুকমে এইস্যা হোতেই নেহি।" এঁদের ব্যবহারে, আচরণে, কথায়বার্তায় কোন সৌজন্য বা সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ এঁরাই হচ্ছেন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিনিধি।

মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছেন শ্রী লোন্ধে। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, স্বাস্থ্যটি বেশ ভাল, মেজাজটি আরও ভাল। সদা হাস্যমুখ। রসিকতা বোঝেন এবং নিজে রহস্যপ্রিয়। ভারি ভাল লাগলো ভদ্রলোককে। সব কাজেই খুব উৎসাহী। ব্যবহার সহজ ও সরল। অমরাবতী পল্লী-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিভাগের অধ্যক্ষ।

বোম্বে থেকে এসেছেন দু'জন মারাঠি, শ্রী বলবন্ত বিশ্বনাথ ফার্ণিক আর শ্রীভানুদাস মনিরাম সাভে। ফার্ণিক মশায় সদাই ব্যস্তবাগীশ, অনেকটা সবজান্তা গোছের লোক। সব কাজেই আগে এগিয়ে যাবেন,—খানিকটা ফপরদালালি না করে ছাড়বেন না। ভাবটা—আমার সবই জানা আছে, তোমরা আমায় দেখে চলো, তাহলেই হবে। লণ্ডন এয়ার পোর্ট থেকে মালপত্র খালাস নিয়ে যখন বাসে উঠছি দেখা গেলো ফার্ণিক মশায় কোন এক মেমসাহেবের ওভারকোট গায়ে দিয়ে আসছেন। নিজের ওভারকোট কোথায় রেখে মেমসাহেবেরটি নিয়ে এসেছেন। খানিক বাদেই এক মেমসাহেব ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফার্ণিককে পাকড়ালেন। যা হোক ফার্ণিক মশায়ের ওভারকোটটিও পাওয়া গেলো। ব্যাপারটা সহজেই মিটলো।

"দূরকে করেছো নিকট বন্ধু"—কবি যখন একথা লিখেছিলেন তখনো বিমান-ভ্রমণ এতোটা সহজ হয়ে ওঠে নি। সময় ও দূরত্বের ব্যবধানকে খর্ব করেছে এই তীব্রগতি বিমান। দুনিয়াটা আজ কতো ছোট হয়ে গেছে সেকথা উপলব্ধি করা যায় বিমানঘাটিতে এলে

আমাদের দমদমে নাকি প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একখানা উড়ো জাহাজ নামছে অথবা উড়ছে। কলকাতা-দিল্লী-বোম্বে এতো মুখের কথা। পৃথিবীর নানা মুলুকের কত বিচিত্র নরনারীর দর্শন পাওয়া যায় কিছু সময় বিমানঘাটির বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করলেই। আমাদের লণ্ডন-গামী বিমান রাত এগারোটায় বোম্বে এসে পৌছলো। এ পর্যন্ত যাত্রী সংখ্যা যা ছিলো বোম্বেতে এসে তা প্রায় দ্বিগুণ হলো। আশেপাশে নানা দেশের লোক। কেউ যাবেন করাচী, কেউবা কায়রো। কেউ থেকে যাবেন জেনিভা, সেখান থেকে যাবেন লুশার্ণ। কেউ যাচ্ছেন প্যারী। অধিকাংশই লণ্ডন। আমাদের গন্তব্যস্থল আরও দূরে কোপেনহেগেন। যেন অর্ধ দুনিয়ার চলন্ত মুসাফিরখানা! কবির উক্তিই ঠিক—"মুহূর্তেকে উত্তরিলা সহস্র যোজন।"

ডেনমার্কের সমাজ

আমরা সাধারণভাবে ইউরোপীয় বা আমেরিকান মাত্রকেই সাহেব বলে থাকি। এই 'সাহেব' সম্বোধনের মধ্য দিয়ে একদিকে প্রকাশ পায় সম্বোধকের প্রচ্ছন্ন হীনমন্যতা, আবার পক্ষান্তরে যাদের "সাহেব" বা "মেম সাহেব" বলা হয় তাঁরাও নিজেদের একটু উঁচু স্তরের মানুষ বলেই মনে করেন। অনুকরণ প্রবৃত্তিটা এখনও বেশ প্রবল। সরকারী আফিসে ও সওদাগরী আফিসে যাঁরা অফিসার পদবাচ্য এবং যাঁরা কোট প্যান্ট পরে আফিস করেন—তাঁরা সবাই সাহেব,—ঘোষ সাহেব, বোস সাহেব, দত্ত সাহেব ইত্যাদি। কেরানী চাপরাসীরা তাঁদের বলবে 'সাহেব'। 'সাহেব' ডাকের ভিতর দিয়ে তথাকথিত অফিসার অনুভব করেন একটু আত্মশ্লাঘা, পদমর্যাদা, Sense of importance। কেরানীরা 'বাবু' অর্থাৎ নিম্নস্তরের লোক। পিওন-চাপরাসী রাষ্ট্রভাষায়

'হুম'। ইংরাজ আমলে কলিকাতা গেজেটে নিয়োগবদলীর বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যেতো যাঁরা বিলেতফেরত তাঁদের নামের আগে বসতো Mr. আর যাঁরা বিলেত যায় নি তাদের বেলায় 'বাবু'। এখন অবশ্য সে ব্যবধান ঘুচে গিয়ে সবাই হয়েছেন "শ্রী"সম্পন্ন, কিন্তু মনোভাবে সেই 'সাহেব' 'বাবু'র অকারণ ও অশোভনীয় প্রভেদটা এখনও ঘোচে নি।

যে কথা বলছিলাম,—আমাদের কালা মানুষের চোখে ডেনমার্কের শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিণীরা সবাই সাহেব-মেম। সাহেব-মেম অর্থাৎ আমাদের প্রাক্তন প্রভু বা প্রভু-পত্নী ইংরেজ সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। সাহেবরা স্বল্পভাষী, গরম মেজাজী, প্রভুত্বপরায়ণ ও ভারতীয়গণের প্রতি কমবেশী অবজ্ঞাসূচক মনোভাব-সম্পন্ন। এই ছিলো সাধারণ ইংরেজ রাজকর্মচারী সম্বন্ধে এদেশের সাধারণ লোকের ধারণা। ধারণাটা যে নেহাৎই ভুল বা ভিত্তিহীন তা নয়। দীর্ঘদিন সাম্রাজ্য বা জমিদারি ভোগ করবার ফলে ইংরেজ শাসকের জমিদারসুলভ চালচলন হাবভাব দেখা দিয়েছিলো, এবং (ভারত) সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেলেও আজ পর্যন্তও সে মনোভাব ধুয়ে মুছে গেছে সে কথা বলা চলে না। কাজেই ডেনমার্কের লোকজনের প্রতিদিনের ব্যবহারে ও সামাজিকতায় ইংরেজ-সাহেবের সঙ্গে একটা আমূল পার্থক্য অতি সহজেই চোখে পড়ে।

* * * *

একটা সহজ ও অনাড়ম্বর অমায়িকতা দিনেমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ ও ভারতীয়গণের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খুব যে বেশী কিছু জানে তা নয়। কিন্তু প্রায় সবাই জানে যে ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন দেশ। আর সেই স্বাধীনতালাভের মূলে মহাত্মা গান্ধীর অসামান্য অবদান। তারা এও জানে যে ভারত শান্তিকামী দেশ এবং সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপনে ভারতের কী নিরলস প্রচেষ্টা।

অতি সাধারণ লোকেও গান্ধী ও নেহেরুর নাম জানে। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত তাঁরা টেগোর বা রবীন্দ্রনাথ এবং কেউ কেউ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম ও চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচিত। এক গ্রাম্য চাষীর বাড়ি গিয়েছিলাম—নাম মিঃ টম্‌সেন (Thomsen)—ইনি ইংরেজী অতি সামান্যই জানেন,—দোভাষীর মারফত কথাবার্তা চললো। গৃহস্বামী উঠে গিয়ে তাঁর বুক-শেলফ থেকে একখানা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ধরনের বই টেনে এনে মহাত্মা গান্ধীর ছবি-খানা দেখালেন। বললেন, গান্ধী একজন মহাপুরুষ যাঁর জীবনকথা শুনতে পেলে সুখী হবেন। একদিন সেই চাষীর বাড়িতে সান্ধ্য-বৈঠকে নিমন্ত্রণ হলো। প্রায় পঞ্চাশ, ষাটজন—চাষী, গ্রামের পাদ্রী, শ্রমিক, প্রৌঢ়া গৃহিণী ও তরুণী মেয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজীতে মহাত্মাজীর জীবনের কয়েকটি ঘটনার বিষয়ে প্রায় ঘণ্টা-খানেক বললাম। বক্তৃতার সারানুবাদ করে যেতে লাগলেন ইংরেজী জানা গ্রামের পাদ্রী মশায়। বক্তৃতা অন্তে নানারূপ প্রশ্ন হতে লাগলো—ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই বেশী। মেয়েরা ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী। দুএকটা প্রশ্ন একটু মজার। যেমন—মহাত্মা গান্ধী অহিংসাবাদের প্রবর্তক, তাহলে ভারতে সৈন্যসামন্ত রাখা হয় কেন? বললাম, যতদিন পর্যন্ত সমস্ত জগৎ অহিংসাবাদী না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অন্তত আত্মরক্ষার জন্য ভারতকে নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখতেই হবে।

আর একটা কথা হলো—তোমাদের দেশে কি এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে? বললাম, শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাচীন প্রথা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। আর বহুবিবাহ এককালে থাকলেও ব্যাপক বা সার্বজনীন সমস্যা তা কোনদিনই ছিল না।

পাল্টা প্রশ্ন তুললাম যেমন তোমাদের দেশে এক মেয়ে একাধিক বিবাহবিচ্ছেদের পর একাধিক স্বামীর ঘর করে তাতে কোন সামাজিক বাধা নেই, তেমনি এক সময়ে আমাদের দেশেও একই পুরুষ একাধিক স্ত্রী নিয়ে ঘর করতো। অবশ্যি হিন্দুকোড বিল পাশ হওয়ার পর এখন আমাদের হিন্দুসমাজে বিবাহবিচ্ছেদ আইনত স্বীকৃত হলো।

বক্তৃতার পর বসল চা-কফির আসর। প্রচুর পরিমাণ চা-কফি, কেক-বিস্কুটের সদ্ব্যবহার চলতে লাগল। আগন্তুকদের কেউ কেউ এক-আধটু ইংরেজী জানে। সবাই ভারতীয় অতিথির সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক। এঁদের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়েই এঁদের অকৃত্রিম অমায়িকতার পরিচয় পেলাম। বাড়ীর বড়ো মেয়ে শুশ্রী ষোড়শী তরুণী ইন্‌গ্রিড (Ingrid) মায়ের সঙ্গে নিজ হাতে কেক বিস্কুট পুডিং তৈরী করেছে। একবার এসে আমায় বলে গেল: "Mr. Roy eat as much as you can. Mother and I have made all these cakes.।" ইন্‌গ্রিড জিম্‌নাসিয়াম (gymnasium) বা হাইস্কুলের ছাত্রী। লেখাপড়ায় ভাল,—ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবে ব'লে ইচ্ছা। ছুটিতে বাড়ী এসেছে। মায়ের কাছে গৃহস্থালীর কাজকর্ম শিখছে।

* * *

এসব দেশে সান্ধ্যবৈঠকগুলিই সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্র। এলসিনোর ইনটারন্যাশনাল পিপল্‌স্ কলেজে (International People's College, Elsinore) মাস দুই ছিলাম। সারাদিন বক্তৃতা, আলোচনা, বিতর্ক, হাতে কলমে কাজ ইত্যাদি। সান্ধ্যভোজন বা ডিনারের পর প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। গান, অভিনয়, নাচ, খেলা (indoor games), বক্তৃতা ইত্যাদি হরেক রকমের প্রোগ্রাম। নাচ-গান এঁদের সামাজিক জীবনের একটা বড় অংশ।

ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতী, বুড়োবুড়ী সবাই গানে আর নাচে নিঃসংকোচে যোগ দেবে। বরং যোগ না দেওয়াটাই অস্বাভাবিক। ইন্টারন্যাশনাল পিপল্স্ কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর পিটার ম্যানিকের (Peter Mannicke) বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর। তাঁর উৎসাহই সবার চাইতে বেশী। সদাহাস্যময় পুরুষ, অতি অমায়িক ব্যবহার। খুঁটিনাটি যে কোন বিষয় নিয়েই যখনই গিয়েছি, তখনই পেয়েছি বন্ধুত্বপূর্ণ সরল ব্যবহার। কলেজ-প্রাঙ্গণের মধ্যেই বাসা—সবার পক্ষেই অবারিতদ্বার। প্রায় সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন। খুব আমুদে লোক। ম্যানিকে-গৃহিণী কাঠখোদাইয়ের কাজে পারদর্শিনী। একদিন ডক্টর ম্যানিকের বাড়ীতে ছিল বৈকালিক চায়ের নিমন্ত্রণ। কথাপ্রসঙ্গে উঠল শ্রীমতী ম্যানিকের কাঠের কাজের কথা। ডক্টর ম্যানিকে এনে দেখালেন কয়েকটি নমুনা,—কাঠের উপর নিপুণ হস্তে খোদাই করা ডেনমার্কের বিখ্যাত শিল্পী, কবি ও দার্শনিকদের প্রতিমূর্তি। ডক্টর ম্যানিকেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কোন প্রতিমূর্তি শ্রীমতী ম্যানিকে তৈরী করেছেন কি?" ডক্টর ম্যানিকে সহাস্যে উত্তর দিলেন, "No, after all, she has a sense of beauty."

ইন্টারন্যাশনাল পিপল্স্ কলেজের সান্ধ্য সম্মেলনে প্রায়ই ভারতীয়-গণের ডাক পড়ত। পিটার ম্যানিকে সরবে ঘোষণা করতেন "Now the Indians will sing।" কী বিপদ! আঠার জন ভারতীয়—কিন্তু গানজানা নেই একজনও। আমরা গান বলতেই বুঝি এককগান (Solo), নিখুঁত সুর-তাল-মান-সমন্বিত কণ্ঠ সঙ্গীত। সমস্বরে বা সমবেত-কণ্ঠে গান গাওয়া আমাদের স্কুল-কলেজে বড় একটা শেখানো হয় না। যখন জাতীয় সঙ্গীত গীত হয় তখনো বড় জোর পাঁচ-ছয়টি বা ততোধিক ছেলেমেয়ে গান গাইবে আর বাকী সব নীরব শ্রোতা। ওসব দেশে প্রথা অন্য রকমের। একক সঙ্গীতেরও যথেষ্ট কদর আছে। বিখ্যাত

জার্মান ও ইতালীয় সঙ্গীত ও দেশীয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত লোকে চেষ্টা ক'রে, সাধনা ক'রে শেখে, এবং তার জন্য চাই জন্মগত কতকগুলি বিশেষ গুণ (aptitude)। কিন্তু সমবেত কণ্ঠে বা কোরাশ গান সবাই গাইতে পারে। স্কুলে, কলেজে, ক্লাবে, খেলার মাঠে যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেই গান চাই। স্কুলে ক্লাস বসবার আগে শিক্ষক বা শিক্ষিকা দু'কলি গান গাইবেন—ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে কোরাশ গাইবে। খেলার মাঠে পনের-বিশ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছে। রাজা এলেন—জাতীয় পতাকার নীচে নির্দিষ্ট রাজাসনের সামনে দাঁড়ালেন। শুরু হল জাতীয় সঙ্গীত। বিশ হাজার নরনারীর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গীত হ'ল।

তাই যখন গানের ডাক পড়ত তখন আমরা বিপদে পড়তুম। আমরা যে গান গাইতে জানিনা সেকথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইত না। শেষে বাধ্য হয়ে, রীতিমতো মহড়া দিয়ে "জন-গণ-মন" এবং ঐ জাতীয় দু'চারটা হিন্দী ও বাংলা গান সবাই মিলে গাইতে শুরু করলাম আর তাতেই মান বাঁচল।

আমাদের স্কুলগুলিতে সমবেতভাবে, সু-স্বরে ও খাঁটি সুরে জাতীয় সঙ্গীত সব ছেলেমেয়েকেই শেখানো উচিত। ডেনমার্কে লোক সঙ্গীতও বেশ জনপ্রিয়। প্রত্যেক স্কুলেই লোকসঙ্গীত-সংগ্রহের অনেকগুলি কপি রাখা হয়। এসেম্ব্লী হলে (Assembly Hall) প্রত্যেকের হাতেই থাকে একখানা গানের বই। প্রধান শিক্ষক বা সঙ্গীত শিক্ষক পিয়ানোতে বসেন—আর সমবেত কণ্ঠে গানের পর গান চলতে থাকে। একটু চেষ্টা করলেই সহজ সুরের কতকগুলি লোকসঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে গাইবার অভ্যাস করা যায়।

এসব দেশের লোক অতি অল্পেতে তুষ্ট। দু'কলি গান বা একটু নাচ যাই করা যাক না কেন প্রাণ ভরে হাততালি দেবে। সমস্ত

জাতটাই নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলে। কী ব্যক্তিগত আচার ব্যবহারে, কী দলগত বা সমষ্টিগত আচরণে কুত্রাপিও নিয়মশৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হতে দেখা যাবে না। অতি বিশ্রী বেসুরো গান বা বিরক্তিকর বক্তৃতা, যাই হোক না কেন—সবাই চুপটি করে শুনবে এবং অনুষ্ঠানান্তে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করবে। অন্যের প্রশংসায় এরা অকৃপণ। অতি সামান্য জিনিস দিয়েই এদের প্রীতি অর্জন করা যায়। অন্তরের সন্তোষ হয় কিনা জানি না, কিন্তু এমনই নিয়মশৃঙ্খলা এবং সৌজন্যের গুণ যে সহজে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করবে না। আমাদের দেশে মানুষকে সন্তুষ্ট করা কতো কঠিন! গাঁয়ের লেখাপড়া না-জানা চাষাভুষার কথা বলছি না। তারা অনেক ভালো, কিন্তু শিক্ষাভিমানী শহুরে বাবুদের মন পাওয়া সত্যি দুষ্কর। সব কিছুতেই এঁরা খুঁত ধরবেন, নাক সিট্‌কাবেন। বেজায় সবজান্তা ভাব! কলকাতার কোন পাব্‌লিক মিটিংএ গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা বা গান-বাজনা-আমোদ-প্রমোদ ছাড়া লোক জড়ো করা খুব সহজ সাধ্য নয়। তারপর meeting manners বা সভাসমিতিতে আচরণ, অনেকেরই খুব সংস্কৃত নয়। বক্তৃতার সময় চলাফেরা করা, কথাবার্তা বলা, সভাগৃহ ত্যাগ করা এবং মনোমত না হ'লে চীৎকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে বক্তাকে অপদস্থ করা—এরূপ আচরণ হামেসাই দেখা যায়। আমরা সহজে অপরকে প্রশংসা করতে নারাজ। পাছে অপরকে প্রশংসা ক'রে নিজে খাটো হয়ে যাই! ওসব দেশের সভায় যে কখনো কখনো হৈচৈ হট্টগোল না হয় তা নয়, কিন্তু সেরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সভাতে শ্রোতাদের আচরণ বাস্তবিকই আদর্শ স্থানীয়।

* * *

সাধারণ লোকের—কি মেয়ে কি পুরুষ সকলের ব্যবহারই ভদ্রজনোচিত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। রাস্তায় হেঁটে চলেছি, মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছেন অচেনা যাত্রী। ভারতীয় দেখে টুপি তুলে অভিবাদন করছে—অবশ্যি গ্রামে, যেখানকার খুব কম লোকই হয়তো ভারতবর্ষের মানুষ চোখে দেখেছে। রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেকেই এগিয়ে এসে অভিবাদন করবে বা করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। যে পথ দিয়ে আমরা প্রতিদিন যাতায়াত করতুম, তারই কোন বাঁকে রোজই দেখতুম ছেলেমেয়েরা নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করছে—আমরা কখন যাই। এগিয়ে এসে "গোমর্ণ" (good morning) বলে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াবে। মেয়েরা আবার এক পা পিছিয়ে ঈষৎ নুয়ে করমর্দন করবে।

ডেনমার্কের শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে বিস্তর ঘুরেছি। কোন-দিনের জন্য কুত্রাপিও দেখি নি যে কেউ কাউকে খুব বড় গলায় ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছে। অথবা দুই দল দাঙ্গাহাঙ্গামা বা মারামারিতে মত্ত। এমনকি কখনও কোথাও চীৎকার বা হল্লার শব্দ পর্যন্ত কানে আসেনি। মানুষের চলাফেরা, চালচলন, আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে একটা সুশৃঙ্খল ও সুসংযত ভাব। প্রশস্ত রাজপথে সারি সারি অগণিত যানবাহন চলেছে। কোন সংঘর্ষ নাই—শব্দও বড়ো একটা নাই। যে যার ডান দিক দিয়ে চলেছে। ইউরোপে এক ইংলণ্ড ও সুইডেন ছাড়া আর সব দেশেই নিয়ম Keep to the right—ডাইনে চল। ইংলণ্ড ও সুইডেনের নিয়ম হচ্ছে Keep to the left—বাঁয়ে চল। আমরা অভ্যস্ত "Keep to the left" নিয়মের সঙ্গে। প্রথম প্রথম কোপেনহেগেনের যানবাহনসঙ্কুল জনাকীর্ণ পথে চলাফেরা করতে ও রাস্তা অতিক্রম করতে কিছুটা অসুবিধা হত। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখছি, ওদিকে ডান দিক হতে হঠাৎ গাড়ী এসে উপস্থিত।

কিন্তু এখানকার গাড়ী চালকেরা যেমনি দক্ষ তেমনি সদ্বিবেচক ও সাবধানী। যেমনটা ইংলণ্ডে দেখেছি এখানেও তাই দেখলাম। অনভ্যস্তের পথচলার বিপদ অনেকটাই কেটে যায় মোটর চালকের দক্ষতা ও শিষ্টাচারের দৌলতে।

ডেনমার্কের পথঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ধরণের। দেশের যে কোন জায়গা হতে অন্য যে কোন জায়গায় যাওয়া যাবে মোটর হাঁকিয়ে পিচঢালা সুন্দর রাস্তা দিয়ে। টুরিষ্ট বাসে সস্তায় দেশভ্রমণের সুব্যবস্থা রয়েছে। অনেকেই আবার বিনাখরচায় হিচ্-হাইকিং (hitch-hiking)এর ভরসায় বেরিয়ে পড়ে। একজন বাঙালী ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল—নাম প্রাণতোষ নাগ—বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স। প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে ডেনমার্কে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেশ থেকে টাকাকড়ি আনবার উপায় নেই। প্রাণতোষ চাষীর খামারে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গতর খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করছেন বলে বল্লেন। কখনো বা খবরের কাগজে দু'একটা প্রবন্ধ লিখেও কিছু রোজগার হয়। পিঠে একটা থলের মধ্যে কিট (Kit) বেরিয়ে পড়েন পায়দলে দেশ দেখতে,—আজ এ জায়গা কাল সে জায়গা। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হ'লে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে ইশারা করলে মোটর চালক গাড়ী থামিয়ে সম্ভব হলে গন্তব্যস্থল নয়তো কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে যায়। এরি নাম হিচ্-হাইকিং।

সুখের স্বর্গ

ডেনমার্ক কল্যাণ-ধর্মী রাষ্ট্র—Welfare State। মাতৃগর্ভে আবির্ভাব হতে শুরু করে ভূগর্ভে সমাধিস্থ হওয়া অবধি জীবনের প্রতি স্তরেই মানুষ

সাহায্য পাচ্ছে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রীয় সমাজ-সেবা-ব্যবস্থা অতি ব্যাপক ও বহুমুখী।

আসন্ন মাতৃত্ব (maternity benefit), শিশুকল্যাণ (children welfare), শৈশব শিক্ষা (Infant education), সার্বজনীন শিক্ষা (Universal Primary education), শিক্ষানবীশী (Apprenticeship), বেকার সাহায্য (Unemployment benefit), রোগ-বীমা (Sickness Insurance), বার্ধক্যের আশ্রয় (old men's home), নিঃখরচায় চিকিৎসা (Free hospital service), সৎকার-সাহায্য (Funeral benefits)—এবং সার্বজনীন বার্ধক্য-পেন্সন (old age pension) ইত্যাদি নানা সাহায্যের অকৃপণ ব্যবস্থা করেছেন রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের মোট আদায়ী খাজনার (revenue) শতকরা চল্লিশ ভাগই ব্যয়িত হচ্ছে সমাজ সেবার খাতে। অবশ্যি এর জন্য জনসাধারণকে যে অতি উচ্চহারে খাজনা বা কর দিতে হচ্ছে সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি যে সকল কঠিন সমস্যায় আজ আমাদের দেশের স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবন বিড়ম্বিত তার কোন বালাই নেই এই "সুখের স্বর্গে" যাকে সে দেশের লোক গর্ব ক'রে বলে "Social Paradise।" আপাতদৃষ্টিতে সে দেশের লোকের নেই কোন দুঃখ, নেই দুশ্চিন্তা। প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য, সুন্দর সুসজ্জিত বাসগৃহ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুগঠিত দেহ, মূল্যবান বেশ-ভূষা, খেলা-ধূলা ও অবসর-বিনোদনের বিস্তর আয়োজন,—ইত্যাদি পার্থিব জীবনের আকাঙ্ক্ষিত যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—কোন কিছুরই অভাব নেই এদের।

চারিদিকেই সম্পদ ও সমৃদ্ধির ছড়াছড়ি! ভিক্ষাজীবী দেশে নাই, ভবঘুরের (Vagrants) সংখ্যাও অতি নগণ্য। দুঃস্থ অথবা দারিদ্র্যগ্রস্ত লোকের দেখা খুব কমই মেলে। চুরি-ডাকাতি রাহাজানি

প্রভৃতি অপরাধ প্রবণতাও আশ্চর্য রকমের কম। অপরাধপ্রবণতার মধ্যে অত্যধিক মদ্যপান ও তজ্জনিত অসতর্ক মোটর চালনা, ট্রাফিক-আইন লঙ্ঘন অথবা হৈ-হুল্লোড় (rowdyism) ইত্যাদিই বেশী। মাতাল মোটর চালকের রক্ত পরীক্ষা ক'রে একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টের বেশী এলকহল (alchohol) পাওয়া গেলেই তাকে আইনে দণ্ডিত হতে হয়। ডেনমার্কে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হয় না। আঠারো বা তার কম বয়সের ছেলেমেয়েদের কোন অপরাধেই গ্রেফ্‌তার করা আইনবিরুদ্ধ। কিন্তু বালক-বালিকা অপরাধীকে "Observation Home"এ বা পর্যবেক্ষণাধীনে রেখে শোধরাবার সুযোগ দেওয়া হয়। ফৌজদারী আইনের শিথিলতা হতে মনে করা অসঙ্গত নয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতাও কম। আর তার কারণও সুস্পষ্ট। কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। এ সব দেশের লোকের ঐহিক জীবনের অভাব-অভিযোগ এতোই সামান্য যে স্বভাব নষ্ট হবার সম্ভাবনা কোথায়? রাস্তার ধারে সাইকেল যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। কেউ ছোঁবেও না। কারণ তারা বলে "One cannot ride two bicycles,"—প্রত্যেকেরই একটি আছে যে। জিনিসপত্র যেখানে সেখানে ফেলে রেখে যাও, হোটেলের ঘর তালাবন্ধ না ক'রে বেড়িয়ে যাও কিছু খোয়ান যাবার ভয় নেই। কিন্তু "এহ বাহ্যঃ"। এই আপাতমনোহর দৃশ্যের অন্তরালে, এই সুখ- সম্ভোগের উপকরণবহুল চাকচিক্যময় জীবনের নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন র'য়েছে এক করুণ বেদনাময় পরিস্থিতি। মানুষের সুখ-সম্পদ রয়েছে প্রচুর, কিন্তু সে অনুপাতে মনের শান্তি বোধ হয় নেই। সুখ-সম্ভোগের আতিশয্য সত্ত্বেও মানুষ আজ উন্মার্গগামী,—সুখের সন্ধানে পাগলের মতো দিকে দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সুখ কোথায়! যে কথা ধনগর্বে গর্বিত

আমেরিকার বেলায় খাটে সেটা বোধ হয় ডেনমার্কের বেলাতেও প্রয়োজ্য।

আমাদের গরীব দেশে মানুষ পেটের জ্বালায় গলায় দড়ি দেয়। আর সেখানে মানুষ আত্মহত্যা করে মনের জ্বালায়। ডেনমার্কে আত্ম-হত্যার সংখ্যা অত্যধিক। অনেককেই এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছি: কেন, কিসের দুঃখে মানুষ নিজহাতে নিজের জীবন নাশ করে? উত্তর পেয়েছি: "নিঃসঙ্গতা, নিরালম্বতা।" কথাটির মধ্যে একটা মর্মান্তিক সত্য নিহিত আছে। মত্ত-মদির যৌবনের শেষে আসে তীব্র প্রতিক্রিয়া। ছেলেমেয়েরা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হলেই সম্পূর্ণ স্বাধীন, বাপ-মায়ের শাসন-কর্ত্তৃত্ব তখন হয়ে পড়ে শিথিল। বিবাহিত পুত্র-কন্যার সঙ্গে বাপ-মায়ের সম্বন্ধ অতি সামান্যই! ছেলেমেয়েরা বিয়ে করেই ভিন্ন নীড় বাঁধে। বিবাহ-ব্যাপারেও বাপ-মায়ের পছন্দ-অপছন্দের অবকাশ বড় একটা নেই বললেই চলে।

ওল্ডমেন্‌স হোমগুলি (oldmen's homes) "বার্ধক্যের বারাণসী" নয়। খাওয়া-দাওয়া, থাকা-পরা সব কিছুরই অতি সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু হলে কী হবে, এই সকল 'হোমসের' যারা অধিবাসী তারা সকলেই দীর্ঘায়ু। স্ত্রীলোকের বেলায় ষাট আর পুরুষের বেলায় পঁয়ষট্টি হচ্ছে পেন্‌সন পাবার বয়স। অবসর গ্রহণের পর ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে "ওল্ডমেন্‌স হোমে" একান্ত নিঃসঙ্গ জীবনের দিনগুলি যেন আর কাটে না! মাইনে-করা সুনিপুণ তত্ত্বাবধায়ক ও শুশ্রূষাকারিণী রয়েছে এদের দেখাশুনা করবার জন্যে। কিন্তু মাইনে-করা আদর-যত্নে স্নেহের পরশ কতটুকু!

বুড়ো বয়সের অবলম্বন নাতি-নাতনীদের সঙ্গে বুড়ো-বুড়ীর সম্বন্ধও অতি সামান্য। ছেলের সংসারে ছেলের বৌ কর্ত্রী। ছেলের বৌ-এর অনুমোদন সাপেক্ষে হপ্তায় একদিন হয়তো দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে নাতি-

নাতনীর দেখা হ'ল। বুভুক্ষিত হৃদয়ের অতৃপ্ত স্নেহাকাঙ্ক্ষা কতটুকুই বা তাতে মেটে!

ভোগসর্ব্বস্ব বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছে পারিবারিক জীবনে। একশো বা এমন কি পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগেও এদেশের সমাজ-জীবনে যতোখানি রক্ষণশীলতা যতোখানি শাসন-বাঁধন ছিল আজ আর তা নেই। রাষ্ট্রপরিচালিত চার্চের (church) প্রভাব জনসাধারণের উপর খুবই সামান্য। প্রতি রবিবারে চার্চে যথারীতি প্রার্থনা হয়ে থাকে, কিন্তু অতি সামান্য সংখ্যক অতি বৃদ্ধ প্রাচীন-প্রাচীনা ছাড়া অন্য কেউ বড় একটা চার্চে যাওয়া প্রয়োজন মনে করে না। তরুণ-তরুণীর দল তো মোটেই নয়। জন্মের পর ব্যাপ্‌টাইজমেণ্ট, বিবাহ ও মৃত্যু,—এইসব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছাড়া মানুষের জীবনে চার্চের আদৌ আর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা বুঝা কঠিন। বিগত শতাব্দীতে বিশপ গ্রুণ্ডভিক (Grundtvig) এবং দার্শনিক কিকেগার্ড (Kikegaard) ডেনমার্কের জাতীয় জীবনের উপর যে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আজ সে প্রভাব প্রায় নিশ্চিহ্ন। আধ্যাত্মিকতার অভাবের জন্যই ভোগসর্বস্ব জীবনের সমস্ত পূর্ণতার মধ্যেও একটা মারাত্মক শূন্যতা রয়ে গিয়েছে।

আমেরিকার মতো এখানকার সমাজজীবনেরও একটা বড় সমস্যা ডিভোর্স (Divorce) বা বিবাহ-বিচ্ছেদ। সামাজিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে এদেশের শহরাঞ্চলে প্রতি তিনটি বিবাহের এবং গ্রামাঞ্চলে প্রতি পাঁচটি বিবাহের একটি বিবাহ-বিচ্ছেদে পরিণতি লাভ করে। দাম্পত্যজীবনের বাঁধন বড়ই শিথিল। ইংলণ্ডের সমাজেও ডিভোর্সের প্রাচুর্য। কিন্তু সেখানে ডিভোর্সের আনুষঙ্গিক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী (Scandal) সবাই বেশ একটু ভয় করে। কাগজে কাগজে ডিভোর্সের কাহিনী ছাপা হয়। ডিভোর্সের পিছনে থাকে বেশ খানিকটা সামাজিক

অখ্যাতি (social stigma)। ডেনমার্কে এসবের বালাই নেই। ডিভোর্স ব্যাপারটা এখানে অতি সহজ এবং ডিভোর্সের দরুণ কাগজের মারফৎ জানাজানিও হয় খুব কম। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্কা বহু মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছি—যাঁরা বিচ্ছেদের দরুণ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। এদের অবস্থা বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে। যে বয়স থাকলে আবার নীড় বাঁধবার উদ্যম করা যেতে পারে সে বয়স আর নেই! দেহে এসেছে মেদ-বাহুল্য, কেশের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিয়েছে শুভ্রতার আভাস! প্রেম-যমুনায় এখন ভাটার টান!

ডেনমার্কের অনেক লোকেই বলেছে, "you Indians look serene"। এদেশের লোকের সুখ আছে প্রচুর, কিন্তু শান্তি নেই বোধ হয় সেই অনুপাতে। বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো সমাজের আর এক দুষ্ট ব্যাধি অবিবাহিত মাতৃত্ব। ডেনমার্কের রাস্তাঘাটে দেখা যাবে তীব্রগামী মোটরসাইকেল-আরোহী তরুণ যুবকের পিঠের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে একটি তরুণী মেয়ে। হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে মোটরসাইকেল। হয়তো যাবে সাগরতীরে নয়তো কোন বনপ্রান্তে। একত্রে যাপন করবে কয়েকটি মধুযামিনী। এরই অপরিহার্য ফল অবিবাহিত মাতৃত্ব। আইনের চোখে গর্ভপাতন দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন 'সত্যকামের' দল, সংখ্যায় বেশী ভারী—আইন এবং সমাজের চোখে এরা অবৈধ-অপাঙ্‌ক্তেয় নয়।

তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশা ও যৌন সংস্রবে যে বর্ণশঙ্করের দল দিন দিন পুষ্ট হয়ে উঠছে তারা আইনতঃ বৈধ হলেও, সমাজের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে অশুভকর। দেশের যাঁরা চিন্তাবিদ্ হিতকামী তাঁরা আজ পরিস্থিতির গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করছেন। সাধারণ জ্বরজ্বারি, সংক্রামক ব্যাধি প্রায় নেই বল্‌লেই চলে। কিন্তু শরীরের ব্যাধির স্থান অধিকার করেছে দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি,"দেবের অসাধ্য

রোগ চিন্তার বিকার।* ডেনমার্কের apotek (ডিস্‌পেন্‌সারি) গুলিতে যে পরিমাণ ওষুধ বিক্রী হয় তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে স্নায়ু-বিকারের ওষুধ। নিওরোসিস্ (Neurosis) এবং অনিদ্রা (insomnia) রোগে ভোগে বিপুলসংখ্যক লোক। নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতা আর উদগ্র ভোগসর্বস্বতা—উভয়ই সমাজের পক্ষে অহিতকর। নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতা আনে কর্মবিমুখতা ও দৈবনির্ভর—যা ঘটেছিল ভারতে বৈদেশিক মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে। ভারতের পতনের অন্যতম কারণ অত্যুগ্র আধ্যাত্মিকতা বিকল্পে অদৃষ্টবাদ। ইউরোপীয় বস্তুতান্ত্রিক ভোগসর্বস্ব সভ্যতা সৃষ্টি করেছে ঈশ্বরবিমুখতা—যার ফলে সুখ-সম্ভোগের সহস্র উপচারের মধ্যে থেকেও লোকের মন আজ উপোসী। বহির্জীবনে প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহ, কিন্তু অন্তরের অন্তরতম দেশে বিরাজ করবে নিবিড় প্রশান্তি,—মানব জীবনের ইহাই পরম আদর্শ, এতেই চরম সিদ্ধি। এই সিদ্ধিলাভের উপায় নির্দেশ করেছেন কবি :—

কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

অর্থাৎ কর্ম-প্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা আসবে ভগবৎ-নির্ভরতার উৎস হ'তে। মহাত্মা গান্ধীর জীবন কর্ম ও ভগবৎ-নির্ভরতার এক অপূর্ব সমন্বয়।

কোপেনহেগেনের আকাশ

লণ্ডন থেকে সোজা তিন ঘণ্টা গগন-পরিক্রমণের পর B. E. A.র (British European Airways) বিরাট প্লেনখানা কোপেনহেগেনের আকাশে উদয় হ'ল। পাইলটের যথারীতি নির্দেশে সিট-বেল্ট বেঁধে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলুম। ধূম্রপায়িগণ জ্বলন্ত সিগারেট নিভিয়ে ভস্মাধারে নিক্ষেপ করলেন। ক্রমে মেঘলোক বিদীর্ণ ক'রে

আমাদের সুপার-কন্‌স্‌টেলেশন বিমানখানা নীচে নেমে আসতে লাগল। আঠারো হাজার ফিট উচ্চতা থেকে অবতরণের সময় বিমানপোত কখনই সরাসরি নামে না। নামে ঘুরে ঘুরে—চক্কর দিয়ে দিয়ে। কাচে ঢাকা গবাক্ষপথে মাটির দিকে তাকিয়ে যে দৃশ্যটি চোখে পড়ল—ঠিক তেমনটি কোথাও এর আগে চোখে পড়ে নি। মনে হ'ল, সমগ্র ভূপৃষ্ঠ যেন একটা দিগন্তবিস্তৃত দাবার ছক্। লাল-নীল-হলুদ-সাদা রংয়ের চেক-কাটা একখানা বিশাল কার্পেট। পরে মাটিতে পা দিয়ে এই দৃশ্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারলাম। তখন ডেনমার্কে মনোরম গ্রীষ্ম-ঋতু। ফুল-ফল-শস্যসম্ভারে প্রকৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। মাঠে মাঠে, প্রান্তরে প্রান্তরে পপি (Poppy) ও টিউলিপ (Tulip) ফুলের অফুরন্ত সমারোহ। লালে নীলে সাদায় বেগুনিতে সবুজে সারা প্রান্তর আচ্ছন্ন—একেবারে ছেদহীন দিগন্তবিস্তৃত। ডেনমার্কের ভূপৃষ্ঠ তরঙ্গায়িত। সারা মুলুকে পাহাড় নেই, কিন্তু ভূমি আমাদের বাংলা দেশের মতো একটানা সমতল ভূমিও নয়। এখানে মাটি ঢেউ-খেলানো—সমস্ত দেশটাই তরঙ্গায়িত। মাঝে মাঝে নীলহ্রদ, যাকে বলে ফিয়র্ড (fjord), আর এখানে সেখানে ঘনসবুজ বনভূমি। শীতের দেশ—গাছপালা, লতাপাতার বৈচিত্র্য উষ্ণমণ্ডলের (Tropical zone) দেশের মতো নয়। শীতের সময় প্রবল তুষারপাতে তৃণগুল্ম সবই যায় মরে। গাছপালা, মাঠ, পথ সবই হয়ে যায় বরফে আবৃত। সমুদ্র-সরোবর জমে বরফ হয়ে যায়। প্রকৃতির সে এক শুচিশুভ্র বৈধব্যের বেশ! ক্বচিৎ দিগন্তব্যাপ্ত কুয়াশার অবগুণ্ঠন ভেদ ক'রে সূর্যালোক ফুটে উঠে—বরফের তখন কী চমৎকার ঝলমলানি! গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুলফলের বৈচিত্র্য খুব বেশী নয়, কিন্তু যা আছে তার আদর-যত্ন কতো! পথের ধারে অতি সাধারণ ঘাসের ফুল—গুচ্ছে গুচ্ছে, স্তবকে স্তবকে ফুটে রয়েছে,—সবই অযত্নসম্ভূত, কিন্তু সযত্নে রক্ষিত। কি গৃহস্থের গৃহ, কি বিদ্যালয় ভবন, কি গির্জা—

সঙ্গে একফালি ফুলের বাগান থাকবেই। জানালায় জানালায় থাকবে টবে-রাখা পাতাবাহার বা মৌসুমী ফুল। ড্রয়িংরুমের সজ্জায় ফুল, খাবার টেবিলে ফুল, শো-কেসে (show-case) ফুল, ভদ্রলোকের বাটন-হোলে (button-hole) ফুল, তরুণীর কেশবিন্যাসে ফুল—সর্বত্রই ফুলের ছড়াছড়ি।

* * * * *

ডেনমার্ক চাষীপ্রধান দেশ। চাষবাস, গো-শূকর-পালন, মাছধরা ও মুরগী-পালন মানুষের প্রধান উপজীব্য। মাঠে মাঠে চাষীরা ট্র্যাক্টর (tractor) বা ঘোড়ার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করছে। গোঠে গোঠে অসংখ্য বিশালদেহাপয়োধরা গাভী ও শক্ত-সমর্থ তেজী ঘোড়া। সারা গ্রীষ্মকালে গরুঘোড়া দিনরাত মাঠে মাঠে চরবে। শীতের সময় এদের গোশালা বা আস্তাবলে বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু শূকরগুলি বারো মাসই থাকে খোঁয়াড়ে। শূকরের প্রধান খাদ্য মাখন-তোলা গো-দুগ্ধ। শূয়োরের যত্ন কতো! ভাল খাইয়ে দাইয়ে এক একটা শূয়োরকে বিপুলবপু ক'রে তোলা হয়। একটা নির্দিষ্ট ওজনের হ'লে পরেই শূয়োরগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয় স্লটার-হাউসে বা কসাইখানায়, যেখানে ইলেক্‌ট্রিক-শক্ দিয়ে এদের করা হয় হত্যা। শূয়োরের মাংস ডেনমার্কের প্রধান খাদ্যগুলির অন্যতম। আবার বহির্বাণিজ্যে বা রপ্তানির মাল হিসেবেও শূয়োরের মাংস—হ্যাম, বেকন ও পোর্ক ডেনমার্কের অন্যতম প্রধান সম্পদ। দেশের নিজস্ব কোন খনিজ সম্পদ নেই। দেশের কলকারখানা, রেলওয়ে-ট্রেন, ট্রাম, ট্রলিবাস, বিজলীবাতি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, মায় রান্নাবান্না সব কিছুর জন্যই প্রয়োজন প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তির। সারা দেশেই বিদ্যুতের ছড়াছড়ি। অথচ সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন উপায় নেই ডেনমার্কে। তাই ডেনমার্কের বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় নিকটবর্তী সুইডেন থেকে।

প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও ডেনমার্কের কোন শিল্প নেই একথা বলা ঠিক হবে না। শিপিং (shipping) বা জাহাজ নির্মাণ ও সিমেন্ট (cement) ডেনমার্কের প্রধান শিল্প। স্লয়েড (slojd) বা কাঠের কাজ এবং ক্যানিং (canning) অর্থাৎ টিনের কৌটায় খাদ্য সংরক্ষণ—এ দুই বিষয়েও ডেনমার্ক অগ্রগামী। বড় বড় শহরগুলির আশে-পাশে গড়ে উঠেছে বিরাট শিল্পাঞ্চল। হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ কাজ করছে এইসকল কলকারখানায়।

* * * *

ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে উচ্চতম জীবনযাত্রার মান সুইটজারল্যাণ্ডে। তারপরই বোধ হয় "স্কেন্‌দিনাভিয়" (Scandinavian) দেশগুলিতে। ডেনমার্কের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান বেশ উঁচু। একজন সাধারণ চাষী—তারও মোটর গাড়ী, টেলিফোন, রেডিও এবং দামী, সুরুচিসম্মত আসবাবপত্র রয়েছে। দেশের প্রতিটি লোকই লেখাপড়া জানা। সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স অবধি সার্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে প্রত্যেকটি বালক-বালিকা আর তার জন্য ব্যবস্থা করছেন রাষ্ট্র। ডেনমার্কের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে সেখানে সর্ব বিদ্যালয়ের দ্বারই ধনী নির্ধন নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সন্তানসন্ততির জন্য খোলা। ইংলণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থায় এখনও পর্যন্ত অভিজাত এবং অন-অভিজাত সম্প্রদায়ে কিছুটা প্রভেদ বিদ্যমান। ইংলণ্ডের তথাকথিত পাব্‌লিক স্কুলগুলি এমন কি বিখ্যাত অক্স্‌ফোর্ড—কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দুটিও ধনীনির্ধন নির্বিশেষে এখনও পর্যন্ত সকলের গম্যস্থান নয়। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার নির্ভর করে অনেকটাই আর্থিক আভিজাত্যের উপর। ডেনমার্কে সে জাতীয় কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নেই। কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কোথাও দেখলাম

না। রাজার তিন মেয়ে। রাজকন্যারা পড়েন কোপেনহেগেনের একটা সাধারণ মিউনিসিপ্যাল স্কুলে। একদিন সেই স্কুল দেখতে গেলাম। একজন শিক্ষিকাকে রাজকন্যাদের কথা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, রাজকন্যারা এখানেই পড়েন বটে, কিন্তু আর পাঁচজন মেয়ের মতোই তাঁদের প্রতি ব্যবহার করা হয়। তাঁদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাই করা হয় না এবং স্কুলের বহু মেয়েই হয়তো জানে না যে এরা রাজার মেয়ে। ভারতবর্ষ গরীব দেশ। এখনও শতকরা দশ-বারোটি ছেলেমেয়ের বেশী স্কুলে যাবার সুযোগই পায় না। কিন্তু সেখানে এখনও পর্যন্ত বড়লোক আর গরীবের জন্য রয়েছে ভিন্ন স্কুল। গরীবের ছেলে-মেয়েরা যায় কলকাতা কর্পোরেশনের বিনা পয়সার বৃত্তী-স্কুলে আর বড়লোকের ছেলেমেয়েদের জন্য রয়েছে ফিরিঙ্গী পাড়ার দামী ইস্কুল। গরীব চাষাভূষার ছেলেমেয়েদের জন্য আছে স্কুলবোর্ডের অবৈতনিক পাঠশালা আর ধনীর সন্তানের জন্য শহরের ভাল ইংরেজী স্কুল। চাষীর ছেলের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা, কারণ সে হবে চাষী বা মজুর, কিন্তু বাবুর ছেলে শিখবে ইংরেজী, কারণ সে হবে অফিসার বা ডাক্তার-উকীল ইঞ্জিনীয়ার। শিক্ষা-পরিবেশনে এই পঙ্‌ক্তি-বিভাগ যতো শীঘ্র দূর করা যায় ততোই মঙ্গল। শিক্ষায় থাকবে সকলের সমানাধিকার। জলবাতাসের মতো শিক্ষাকেও মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত করে নিতে হবে। গণতন্ত্রের মূলনীতি শিক্ষায় আপামর জনসাধারণের সমানাধিকার। ডেনমার্কের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই মূলনীতি সম্যক্ প্রতি-পালিত হচ্ছে। ডেনমার্কের শিক্ষা-ব্যবস্থার আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য।

লণ্ডনের কয়েকটি দিন

লণ্ডন, ৪ঠা জুন ১৯৫৪। কায়রো, জেনিভা, প্যারি ছুঁয়ে ছুঁয়ে লণ্ডন পৌঁছানো গেল। তখন বেলা পাঁচটা। গ্রীষ্মের গোধূলি—আলোর প্রাচুর্যে লণ্ডন বিমানঘাঁটি আর তার আশপাশের অঞ্চল ঝলমল করছে। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ যেমন দীর্ঘ তেমনি উপভোগ্য। আমাদের ভাগ্য ভাল, সেদিন বৃষ্টিবাদল ছিল না—নইলে ইংলণ্ডের আবহাওয়ার মতিগতির স্থিরতা নেই। অবতরণের আগে বিমানপোতটি লণ্ডন শহরের মাথায় বেশ খানিকক্ষণ চক্কর দিয়ে ঘুরল। মহানগরের সে এক মনোহর মূর্তি! টেমস্ নদীর রূপালী ধারায় সারা শহরটি যেন দুই পাড়ায় দ্বিখণ্ডিত। সেণ্ট পল গির্জার গম্বুজ, ওয়েষ্টমিন্ষ্টার হল, নব নির্মিত মার্কিনি ঢংএর চাঁছাছোলা (streamlined) অট্টালিকা ছোট্ট খেলাঘরের মত দেখাচ্ছিল। লাল টালির দোচালা বাড়ীই বেশী—সারি সারি। মাঝখান দিয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে অসংখ্য রাজপথ আর সর্পিল গতিতে সংখ্যাতীত যানবাহন। ভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায় ভগ্নাংশ বা খণ্ডরূপ, কিন্তু অখণ্ডরূপের আভাস পেতে গেলে ভূমাকে অবলম্বন করতে হবে। বিমান-ভ্রমণের এই তো সুবিধা! যাকে বলে Bird's eye view।

এয়ারপোর্ট থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে সারে (Surrey) শহরতলী। মোটরে এই পথ অতিক্রম করা গেল। পথের ধারে ধারে সারি সারি দোকান, সরাইখানা ও বাড়ী—সবই সাজানো গোছানো—মাঝে মাঝে উদ্যান এবং ফাঁকা মাঠ। ক্রমে শহর ছেড়ে শহরতলীর

লণ্ডনের স্নায়ু-কেন্দ্র
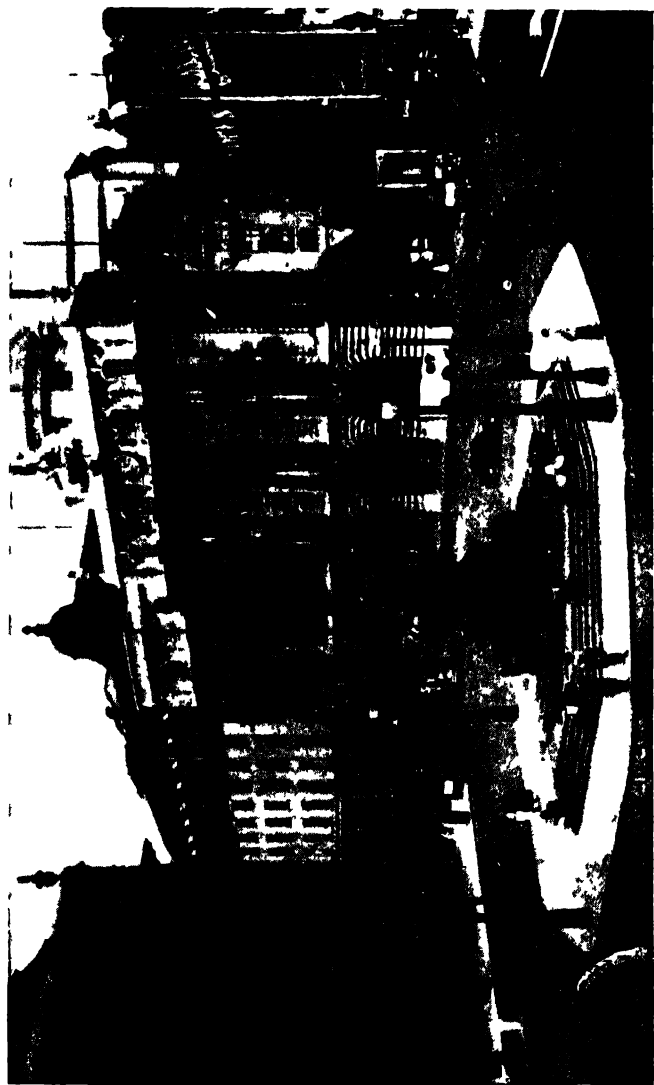
অস্ট্রেলিয় শহরের সুদৃশ্য রাজপথ

সমুদ্র তীরে ওয়েলিংটন শহর

দিকে এগুতেই চারদিকের শান্ত নীরবতা মনকে আকৃষ্ট করলো। বুহ গাড়ী চলেছে পথ দিয়ে—পথের ধারে ধারে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি গৃহস্থ বাড়ী—কিন্তু সবই নীরব। পথে বা ফুটপাথে পদচারীর সংখ্যা অতি নগণ্য—দূরে মাঠের অপর প্রান্তের পল্লার কোন বাড়ীর চিম্‌নি দিয়ে একটু ধেঁায়ার আভাস দেখা যাচ্ছে। ঘরে ঘরে এখনও বিজলী বাতি জ্বলেনি। মোটর যাচ্ছে রাস্তার উপর ব্রীজ দিয়ে—নীচ দিয়ে হুস্ ক'রে একটা ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন ত্বরিৎ গতিতে বেরিয়ে গেল। এতটা পথ অতিক্রম করা গেল, কিন্তু পথে কোথাও একটা হর্ণ বাজতে শুনলাম না। এসব দেশে ট্রাফিক এডুকেশন দেওয়া হয় জনসাধারণকে অত্যন্ত যত্নের সহিত। প্রত্যেক মোটর চালকই পথচলার আইন-কানুন মেনে চলতে চেষ্টা করে। পথচলার শৃংখলা বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিস। এক জনের পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেড়িয়ে যাবার চেষ্টা বিরল। দুর্ঘটনা যে না হয় তা নয়, কিন্তু যানবাহন চলাচলের আধিক্যের তুলনায় নগণ্য। আর এসব দেশের মোটর চালকেরা পদব্রজী পথচারীর প্রতি আশ্চর্যজনক সুবিবেচনা দেখিয়ে থাকে। লণ্ডনে, কোপেনহেগেনে এবং অন্যান্য শহরেও দেখেছি যে মোটর চালকেরাই পথচারীকে আগে পথ ছেড়ে দেয়—ঠিক আমাদের কলকাতার উল্টো। মোটরে চড়েছ কি লাটসাহেব! কারু দিকে তাকাবার দরকার নেই। তেমনি আবার পথচারীর আচরণ, —দেখছে গাড়ী আসছে তবু রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে থাকবে,—ভাবটা একটিবার চাপা দিয়েই দেখ না—মজাটা টের পাবে। কলকাতার রাস্তায় হরেক রকমের আওয়াজ—ফেরীওয়ালার বিচিত্র সুরের চীৎকার —মোটরের ভেঁপু—মোটর বাসের পাঞ্জাবী কন্‌ডাক্‌টর-ড্রাইভারের সরব আহ্বান—'খালি গাড়ী খালি গাড়ী—শ্যামবাজার—বউবাজার— ধরমতলা—মাণিকতলা—শিয়ালদা—হাওড়া।' সারা শহরটাই যেন একটা লাউডস্পীকারের দোকান। লণ্ডনের মত বড় শহর—সেরিং ক্রশ

(Charing Cross), পিকাডিলি সার্কাস (Picadilly Circus)—যেখানেই হোক না কেন—হাজারে হাজারে গাড়ী আর কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে—কিন্তু নিঃশব্দে, নির্ঝঞ্ঝাটে। হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, ঠেলাঠেলি কিছুমাত্র নেই। সব যেন চলেছে কলের পুতুলের মতো সারিবদ্ধ সুশৃংখল। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে যতো অসম্ভব ভিড়ই হোক না কেন, কখনো ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি হতে দেখিনি।

সারে (Surrey) পল্লীর এক প্রান্তে বাগান-ঘেরা সেলস্‌ডন পার্ক। হোটেলে থাকার জায়গা ঠিক হয়েছে সেইখানে। হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরটিতে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে গ্রীষ্মকালীন ইংলণ্ডের বিশেষ রূপটি চোখে পড়ে। সযত্নরক্ষিত বাগানে পপ্‌লার, চেস্‌টনাট ও চেরী গাছের ছড়াছড়ি। দূরবিস্তৃত প্রান্তরের শেষে জনপদ। মাঠে মাঠে পপির সমারোহ—একেবারে লালে লাল। ডেফোডিলের বাহার সবে শেষ হয়েছে ; এখন শুরু হয়েছে লাইলাক (Lilac), রডোডেনড্রন আর টিউলিপের মরশুম। শীতের দেশ—পাখি খুব বেশী নাই। কিন্তু যা আছে তার সমাদর কত! Bird-watching অথবা পাখির গতিবিধি নিরীক্ষণ কেবল জন কয়েক খেয়ালী লোকের অবসর বিনোদন নয়। রীতিমতো, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এঁরা পাখির গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে থাকেন। কত বইই না এ বিষয়ে লেখা হয়েছে। ভাল ভাল মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকায় সুন্দর ও সচিত্র পাখি বিষয়ক প্রবন্ধ লেখা হয়। পক্ষী-নিরীক্ষণ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বিষয়। প্রায়ই দেখা যায়—পার্কে পার্কে, বনে বনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পাখি দেখবার জন্য দল বেঁধে, কখনও বা একা একা বেরিয়েছে। সঙ্গে হয়তো রয়েছেন শিক্ষিকা যিনি পাখির গোত্র-পরিচয়, স্বভাব, বাসভূমি ইত্যাদি বিষয় বলে বলে দিচ্ছেন। লণ্ডনের রাস্তায় রাণী অ্যানের স্মৃতি-স্তম্ভের উপর একবার একজোড়া করোমেণ্ট

(পান-কৌড়ি) তো দিন দুই নিশ্চল হয়ে বসেছিল। তাই দেখবার জন্য কতো লোকের আগ্রহ! কতো ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্, কাগজে কাগজে কতো না বিজ্ঞাপন! ইংরেজ চরিত্রের একটা বিশেষ দিক লক্ষ্য করবার বিষয়—খুঁটিনাটি জিনিসে এদের অপরিসীম আগ্রহ ও কৌতূহল।

সেলস্‌ডন পার্ক হোটেলের আরাম শয্যায় কয়েক রাত মন্দ কাটান গেল না। লণ্ডনে হোটেল, রেঁস্তোরা ও গেষ্টহাউসের ছড়াছড়ি। ট্যাঁকে পয়সা থাকলে আরাম আয়াসের চূড়ান্ত করা যায়। আবার কম পয়সার হোটেলও আছে। কেবল বেড্ ব্রেকফাষ্টের বন্দোবস্ত ও থাকবার সুবিধা হতে পারে। সেলস্‌ডন পার্ক হোটেলটি মাঝারি ধরণের, কিন্তু আমার স্ট্যাণ্ডার্ডে আশাতীত রকমের ভাল। বেশ প্রশস্ত একটি ঘর, সঙ্গে বাথরুম। পুরু নরম কার্পেট-বিছানো মেঝে, সুদৃশ্য কাগজে মোড়া দেয়াল। দেয়ালে কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। আসবাবপত্র সুরুচির পরিচায়ক। তুলতুলে নরম স্প্রিংএর বিছানা,—পাখির পালকের (down) লেপ। শিয়রে সুদৃশ্য ডোম আর টেলিফোন। আর কি চাই? সারা দিন লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে আরামের ঘুমে রাত কেটে যেত। ঘুমের ঘোর না কাটতেই কানে আসত একটা মৃদু মধুর আহ্বান—পিউ, পিউ, পিউইট্। জানালার ধারে যে ঝাউ গাছটা তারই পত্রপল্লবের আড়ালে বসে ছোট্ট পিউইট (Peewit) পাখি প্রভাত বন্দনা গাইছে।

অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের চিন্তানায়করূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ডক্টর স্যামুয়েল জন্‌সন্। সমসাময়িক ইংলণ্ডের কাব্যাদর্শ, সাহিত্যধর্ম, চিন্তাধারা, সামাজিক মান ও জাতীয় মানস যে সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিদ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হ'ত ডাঃ জন্‌সন্ ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য। লণ্ডন সম্বন্ধে ডাঃ জন্‌সনের উক্তি:

"Why, sir, you find no man, at all intellectual, who

is willing to leave London. No sir, when a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford."

ইংরেজ জাত স্বভাবতঃই রক্ষণশীল এবং স্বল্পভাষী। উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ইংরাজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। মেপে জুকে ওজন করে কথা বলাই ইংরেজের স্বভাব। উত্তম জিনিসকে এরা বলবে মন্দ নয়। প্রতিজ্ঞা না ক'রে বলবে দেখব। কোন জিনিসকে অপছন্দ হলেও ভাবটা গোপন রেখে বলবে ইন্টারেস্টিং (interesting) ইত্যাদি। এহেন গুমোর (reserve) যে জাতের তাদেরই মুখপাত্র ডাঃ জনসনের উক্তি কিছুটা অতিশয়োক্তি বলে মনে হলেও এটা ঠিক যে এই ঐতিহাসিক নগর লণ্ডনে দেখবার ও জানবার অসংখ্য জিনিস রয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার মোড়লি আমেরিকার হাতে,—অর্থে ও ঐশ্বর্যে আমেরিকার দোসর নেই, কিন্তু আমেরিকা হচ্ছে হালে বড়লোক, হাল্কা, ভূঁইফোঁড়। ইংরেজ হচ্ছে বনেদী বড়লোক—ঐশ্বর্যের দাপটে আমেরিকার কাছে হীনপ্রভ, কিন্তু আছে প্রাচীনতার সম্ভ্রম, বনেদী বংশের সংযম। অতীত ও বর্তমান, অচল ও সচল, সুন্দর ও সাধারণ, বিস্ময়কর ও তুচ্ছ—অনেক কিছুই ছড়ানো রয়েছে এই মহানগরের বুকে। প্রথমটা ইংরেজকে অনেকেই ভুল বুঝে থাকে, তার কারণ হচ্ছে ইংরেজের বাহিরটা বড় অসামাজিক। ইংরেজ বড় রিজার্ভ (reserve)। কিন্তু এই নীরস বহিরাবরণের অন্তরে একটি সংবেদনশীল সহৃদয় মন লুকিয়ে থাকে। ইংরেজের মন পাওয়া কিছুটা সময় সাপেক্ষ। এটিকেট (etiquette) ও ফরম্যালিটির (formality) পর্দা সরিয়ে অন্তরের অন্দরে প্রবেশ করতে হয়। আগে যেচে আলাপ করা ইংরেজের রীতি নয়। আলাপ শুরু করবে হয় আবহাওয়া নয় বড়জোর ছুটি কেমন কাটল এই কথা দিয়ে। আলাপ হবে সংক্ষিপ্ত; তারপরেই বলবে,

"পরে দেখা হবে, বিদায়।" কিন্তু ইংরেজের বন্ধুত্ব নির্ভরযোগ্য—কথার খেলাপ ইংরেজ বড় একটা করে না, কথা দিলে কথা রাখার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক অবস্থার বিপর্যয়ে ইংরেজের সসাগরা সাম্রাজ্য আজ ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। ইংরেজ আজ বুঝতে পারছে যে দুনিয়াজোড়া জমিদারি আর রাখা চলবে না। আন্তর্জাতিক সাম্য ও মৈত্রী ভিন্ন বিশ্বের শান্তি সংরক্ষণ অসম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সহযোগিতা আজ তার কামনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই লণ্ডনে এবং ইংলণ্ডের শহরে ও পল্লীতে বিদেশী আগন্তুক আজ স্বাগত সম্ভাষণ লাভ করছে।

ইংলণ্ডের সেকাল ও একাল

ডক্‌টর জন্‌সনের কথা বলছিলাম। ফ্লিট স্ট্রীট থেকে শুরু করা যাক্। খাস লণ্ডন 'সিটি' আর অভিজাত পল্লী 'ওয়েসট্ এণ্ড'—এ দুয়ের সংযোগ সাধন করেছে ফ্লিট স্ট্রীট। কথাটা ইংরেজীতে ব্যবহৃত হয় সাংবাদিক মহল বা সংবাদপত্র-জগৎ এই অর্থে। লণ্ডনের অনেকগুলি রাস্তার নামের সঙ্গেই এই রকম একটা বিশেস অর্থ যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন লম্বার্ড স্ট্রীট্ বলতে বুঝায় ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-জগৎ—যেমন নিউইয়র্কের ওয়াল্ স্ট্রীট্। ফ্লিট্ স্ট্রীট্ হচ্ছে খবরের কাগজের রাস্তা—যত সংবাদপত্রের অফিস এ রাস্তার দু'ধারে। তদানীন্তন সংবাদপত্র জগতে ডক্‌টর জনসনের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ফ্লিট্ স্ট্রীট্ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে গাফ্ স্কোয়ারে—যেখানে পণ্ডিতপ্রবর বাস করতেন। কাছেই বিখ্যাত "চেশায়ার চিজ্ ইন" (Cheshire Cheese Inn)—যেখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে জন্‌সন্ অফুরন্ত আড্ডা জমাতেন। সেই পুরানো সরাইখানা এখনও তেমনটিই আছে।

ইতিহাসের দিক দিয়ে টাওয়ার অব্ লণ্ডনের খ্যাতি যথেষ্ট। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বিজয়ী উইলিয়মের সম্মানে এই সৌধটি নির্মিত

হয়েছিল। এখনও এই সৌধ-প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে প্রাচীন রোম্যান প্রাচীরের ভগ্নশেষ দেখতে পাওয়া যায়। টাওয়ার অব্ লণ্ডন একাধারে রাজপ্রাসাদ ও কারাগার। সবুজ চত্বরের মাঝখানে যে প্রস্তরমণ্ডিত স্থানটি চিহ্নিত রয়েছে সেখানেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত বিশিষ্ট ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করা হ'ত। এখানেই রাজা অষ্টম হেনরীর দ্বিতীয়া পত্নী রূপসী এ্যানে বোলিনের শিরশ্ছেদ হয়েছিল—তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল রাজসভার গায়কের সঙ্গে যৌন ব্যভিচারের অভিযোগ। নিষ্ঠুর ও কামুক অষ্টম হেনরীর পঞ্চমা পত্নী ক্যাথারিন হাওয়ার্ডকেও এখানেই হত্যা করা হয়। হতভাগ্য বন্দীকে টেমসের জলপথে টাওয়ারে এনে ট্রেইটরস্ গেট (দেশ-দ্রোহীর দরজা) দিয়ে ব্লাডি টাওয়ারের কারাগারে নিক্ষেপ করা হতো। অষ্টম হেনরীর উক্তি—"Love never dies. Love killed, gives birth to a fresh love." ব্লাডি টাওয়ার ছাড়াও আর একটি টাওয়ার আছে—নাম ওয়েক্ফিল্ড টাওয়ার। এখানেই রক্ষিত আছে ইংলণ্ডেশ্বরীর যাবতীয় হীরা, জহরৎ, মণি-মাণিক্য, অলঙ্কার ও মুকুট ইত্যাদি যা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন সসাগরা পৃথিবীকে দোহন ক'রে নিজ ভাণ্ডারে সঞ্চয় ক'রে রেখেছে।

আজ হাজার বছর ধ'রে টাওয়ার অব লণ্ডন নিজে অপরিবর্তিত থেকে মহানগর লণ্ডন তথা সারা ইংরেজ জাতের পরিবর্তন-বিবর্তন লক্ষ্য ক'রে এসেছে। অতীতের এত বড় সাক্ষী লণ্ডনে খুব বেশী নেই।

টাওয়ারের অনতিদূরে (মাইল খানেকের বেশী নয়) সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছ বিখ্যাত সেণ্ট পল্স্ ক্যাথিড্রাল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের (Great Fire of London) পূর্ববর্তী ক্যাথিড্রালটি ভস্মীভূত হয়। তারপর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধ'রে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি স্যার ক্রাইস্টোফার রেন এই বিশাল সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন। এর বিরাট গম্বুজ, সুদীর্ঘ খিলান, বাহির ও অন্তর্সজ্জা বিস্ময়কর। এই

ক্যাথিড্রালের চত্বরে চিরনিদ্রায় সমাহিত রয়েছেন ওয়াটারলু-বিজয়ী বীরবর ডিউক অব্ ওয়েলিংটন আর ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ-সেনাপতি ট্রাফাল-গার বিজয়ী হোরাসিও নেলসন্। ইংলণ্ডের স্থাপত্য প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল আর লণ্ডনের ঐতিহাসিক সৌধ ও স্তম্ভের অধিকাংশই হচ্ছে স্যার ক্রাইস্টোফার রেনের অক্ষয় কীর্তি। চারদিকেই ছড়িয়ে আছে রেনের অসংখ্য সৃষ্টি। রেন ছিলেন দীর্ঘায়ু—আশি বৎসরেরও বেশী বেঁচেছিলেন তিনি। জীবনের শেষদিন পর্যন্তও তাঁর সৃজনের বিরাম ছিল না। মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিফলকে কী লেখা হবে, একথা জিজ্ঞাসা করায় স্যার ক্রাইস্টোফার বলেছিলেন, "*Ci monumentum queris circumspriece,*—if you look for my memorial, look around." স্যার ক্রাইস্টোফারের এটা দম্ভোক্তি নয়। এত বড় গৌরবের দাবী তিনি যথার্থই করতে পারেন।

সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের অনতিদূরে দেখতে পাওয়া যাবে সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতাল—পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন আরোগ্যাগার। হাস-পাতালের দেওয়ালে তিনজন প্রোটেস্ট্যাণ্ট্ ধর্মযাজকের স্মৃতিফলক প্রোথিত রয়েছে। এঁরা তিনজন ছিলেন ক্র্যানমার, ল্যাটিমার ও রীড্লে। ধর্ম-বিদ্বেষ-বহ্নির এঁরা হচ্ছেন অবিস্মরণীয় আহুতি। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি রাস্তা খুঁড়ে পয়ঃপ্রণালী তৈরি করবার সময় মজুরেরা মাটির নীচে থেকে পোড়া কাঠের গুঁড়ি আর কিছু অদগ্ধ মানুষের হাঁড় বের করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্যাথালিক রাণী ম্যারী টিউডর এঁদের জীবন্ত দগ্ধ করেছিলেন।

প্রাচীন লণ্ডন ছেড়ে নবীনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক্। থ্রেড্নিড্ল স্ট্রীট, লোম্বার্ড স্ট্রীট, থ্রগামরটন্ স্ট্রীট এবং কর্ণহিল—এই নিয়ে হচ্ছে ইংলণ্ডের আর্থিক জগৎ। এই অঞ্চলটাই লণ্ডনের সব চাইতে কর্মব্যস্ত অঞ্চল। কিন্তু কর্মব্যস্ততা সব দিনের বেলায়—আমাদের

ডালহৌসী স্কোয়ার ও নেতাজী সুভাষ রোডের মত। লণ্ডনের এ অঞ্চলটায় রাতের বেলায় থাকে কেবল ঈষৎ-মত্ত দারোয়ানের দল যেমন আমাদের কলকাতায় দেখতে পাওয়া যাবে খৈনি-খোঁড়ের আড্ডা। এখানেই ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড, ম্যানসন হাউস এবং রয়্যাল এক্স্চেঞ্জ। রয়্যাল এক্স্চেঞ্জ বিল্ডিংএর শীর্ষদেশে স্থাপিত রয়েছে গোল্ডেন গ্রস্হপার (সোনার গংগা ফড়িং)।

রয়্যাল এক্স্চেঞ্জের প্রতিষ্ঠা করেন স্যার টমাস গ্রেসাম ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে। প্রচলিত কিংবদন্তী হচ্ছে যে অতি শৈশবে পিতামাতা কর্তৃক ভবিষ্যৎ স্যার টমাস গ্রেসাম এক শুকনো ঘাসের মাঠে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে শিশুর কর্ণগহ্বরে এক গংগা ফড়িং প্রবেশ করে। যন্ত্রণায় কাতর শিশুর কান্না শুনে এক পথচারী তাকে উদ্ধার করে। পরবর্তী জীবনে এই পিতামাতা পরিত্যক্ত শিশুই ইংলণ্ডের আর্থিক জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

ওয়েষ্ট এণ্ড—লণ্ডনের অভিজাত পল্লী। ইতিহাসের বহু পদচিহ্ন এর বুকে অঙ্কিত আছে। রাজকীয় প্রাসাদ, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, ধনীর আবাস ভবন এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থা সমূহের বেশীর ভাগই ওয়েষ্ট এণ্ডে। ওয়েষ্ট এণ্ডের সব চাইতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক সৌধ হচ্ছে ওয়েষ্ট মিন্স্টার অ্যাবি। এয়োদশ শতকে রাজা তৃতীয় হেনরী এই ইমারতটি নির্মাণ করেছিলেন রাজর্ষি এডোয়ার্ড দি কনফেসরের স্মৃতিরক্ষার্থে। ইংলণ্ডের অন্য যে কোন প্রাসাদ বা সৌধ অপেক্ষা ওয়েষ্টমিনস্টার অ্যাবি অধিকতর ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত। বহু রাজা-রাণী, বীর, কবি ও মহাপুরুষের নশ্বর দেহ অ্যাবির চত্বরে সমাহিত রয়েছে। এরই অভ্যন্তরে প্রসিদ্ধ 'পোয়েট্স্ কর্ণার'—যেখানে ইংলণ্ডের বহু শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যস্রষ্টা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন। এখানেই ক্যাণ্টারবেরি টেল্সের রচয়িতা ইংরেজী সাহিত্যের জন্মদাতা জিওফ্রে

চশারের দেহাবশেষ। অ্যাবির পশ্চিম দ্বারদেশের সন্নিকটে এক কৃষ্ণমর্মর নির্মিত সমাধিতলে শায়িত রয়েছেন প্রথম মহাযুদ্ধের অজ্ঞাতনামা যোদ্ধা (the unknown soldier)। এইখানেই রয়েছে উইলিয়ম সেক্সপীয়রের স্মৃতি-ফলক।

টেমস্ নদীর ধারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গৃহ—ওয়েষ্ট মিন্‌স্টার হল। বিগত বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪১ সনের ১০ই মে জার্মাণ বোমায় হাউস অব্ কমন্‌স্ গৃহটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। বর্তমান হাউস্ অব্ কমন্‌স্ যুদ্ধের পর পুনর্নির্মিত হয়েছে। এই বহু প্রাচীন গৃহের অভ্যন্তরে ইতিহাসের কতো অভিনয়ই না অভিনীত হয়েছে। এখানেই বিচার হয়েছিল রাণী এলিজাবেথের প্রণয়ী আর্ল অব এসেক্সের, এখানেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল গাই ফক্স—যে বারুদে আগুন দিয়ে গোটা পার্লামেণ্টকে উড়িয়ে দিবার ষড়যন্ত্র করেছিল। এখানেই রাজা প্রথম চার্লসের বিচার ও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। যে প্রকোষ্ঠে প্রথম চার্লসের বিচার হয়েছিল সেই প্রকোষ্ঠেই রাজবিদ্রোহী ক্রমওয়েলের নরকঙ্কাল শিকবিদ্ধ হয়ে রক্ষিত হয়েছিল ১৬৬১ হ'তে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ অবধি। তারপর একদিন প্রবল ঝড়ে সে মাথার খুলি কোথায় যেন উড়ে যায়।

পার্লামেণ্ট গৃহ হতে সোজা উত্তরে গেলেই ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে আসা যাবে। কাছেই ওয়ার অফিস, ট্রেজারি, এ্যাড্‌মিরাল্‌টি এবং অন্যান্য সরকারী দপ্তর। একটু দূরেই একটি ছোট্ট অপরিসর গলি—যার দশ নম্বর বাড়ীতে থাকেন গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী। গলিটির নাম ডাউনিং স্ট্রীট। এখানে বাস করছেন অশীতিপর রাজনীতিজ্ঞ, বাগ্মীপ্রবর স্যার উইনস্‌টন চার্চিল, যিনি একাধারে রাজনীতিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। বিশ্ব মহাযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ক'রে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে ম্যাল্ (Mall) ধ'রে চ'লে গেলেই আসা যাবে ইংলণ্ডেশ্বরী দ্বিতীয়া এলিজাবেথের লণ্ডনাবাস প্রসিদ্ধ বাকিংহাম প্যালেসে। তরুণী রাণীকে ইংরেজ জাতি খুব ভালবাসে। সাধারণ ইংরেজ একটু গর্বের সুরেই বলবে "Our young and beautiful Queen." প্রাসাদের দ্বারদেশে স্বর্ণশিরস্ত্রাণ পরিহিত অশ্বারূঢ় প্রহরী দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। সম্মুখের রাজপথ দিয়ে যানবাহন ও পথচারীর দল চলেছে অবিরাম। কিন্তু সেই প্রহরী সৈনিকপুরুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠিক একভাবে নিশ্চল অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে আসীন রয়েছেন।

একদিন প্যালেসের বহিরাঙ্গনে রাণীর জন্মদিন উৎসব উপলক্ষ্যে রক্ষীদলের (Cold Stream Guard) কুচকাওয়াজ দেখা গেল। রাণীর পিতৃব্য ডিউক অব্ গ্লস্‌টার কুচকাওয়াজের মহড়া পরিদর্শন করছিলেন। এই বাকিংহাম প্যালেসেই একদিন মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন নগ্ন, দরিদ্র ভারতের প্রতিভূ অর্ধনগ্ন রাজদ্রোহী ফকির—"half-naked seditious fakir" (Churchill)—মহাত্মা গান্ধী—সেই কথাই মনে পড়ল।

নিষ্কর্মা ভবঘুরের আদর্শ জায়গা লণ্ডন। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্য এতো চমৎকার জায়গা দুনিয়ায় আর একটি নেই। কিন্তু পকেটে কিছু পয়সা চাই, কারণ লণ্ডনের জলহাওয়ার হজ্‌মি গুণ। খানিকবাদেই খিদে পাবে। যতক্ষণ খুশি ঘুরে বেড়াওনা ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ হবে না—নানা জিনিস রয়েছে দেখবার। ইংরেজ জাতের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য ভাল ক'রে বুঝতে হলে আঁতি পাঁতি ক'রে লণ্ডনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে হবে। দিনের আর রাতের লণ্ডন—তাই বা কতো তফাৎ! যাও হাইড পার্কে, যাও রিজেণ্ট পার্কে—কত রকমারি দৃশ্যই না চোখে পড়বে! রিজেণ্ট পার্কের সরোবরে রাজহংসদলের নিরুদ্বেগ সঞ্চরণ, কৃত্রিম দ্বীপে প্রশস্ত চঞ্চু

পেলিক্যানের গাত্র-কণ্ডুয়ন—তাই হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখনা—সময় কেটে যাবে ধাঁ ক'রে। নৌবিহারে মত্ত রয়েছে অসংখ্য নরনারী। কেউ বা অশ্বারোহনে অবসর বিনোদন করছেন। বক্তা হবার আকাঙ্ক্ষা থাকলে অবশ্যই হাইড পার্কে আসতে হবে। এখানে সেখানে ছোট্ট টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তার দল গলাবাজি ক'রে যাচ্ছে—কিছু কিছু শ্রোতাও আছে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু হরেকরকম—পরশুরামি ভাষায় "অর্থ, পরমার্থ ও বাঘ"। ওই যে ঝোঁপের ধারে ধারে বসবার বেঞ্চ, ওই যে লন (lawn)—পঞ্চশরের পাদপীঠ। লণ্ডনে স্থানাভাব—single flat পাওয়া দুষ্কর। তাই জোড়ায় জোড়ায় প্রেম-পিপাসিতের দল,—

"যেথায় সুখে তরুণ যুগল পাগল হয়ে বেড়ায়,
আঁধার বুঝে আড়াল খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়।"

হাইডপার্ক আদর্শ প্রেমতীর্থ! কিন্তু কারো আঁখি এড়াবার বালাই এদের নেই। প্রায় সবই খোলাখুলি—nothing to hide in the Hyde Park, চুম্বন, আলিঙ্গন……ইত্যাদি প্রায় প্রকাশ্যেই চলছে। তবে কেউ কারুর দিকে নজর দিচ্ছে না—সবাই নিজেকে নিয়ে মত্ত। একজন ইংরেজ বন্ধু বললেন, It's a strenuous job, this courting—a whole-time occupation for a year, sometimes even more."

লণ্ডনের দর্শনীয় স্থান ও বস্তু অসংখ্য—আর অনেক কিছুর পিছনেই রয়েছে একটু রোমাঞ্চকর ইতিহাস। ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারের কাছাকাছি হোয়াইট হল। ভারি সুন্দর একটি প্রস্তর মূর্তি হোয়াইট হল রাস্তার একান্তে। রাজা প্রথম চার্লসের প্রতিমূর্তি। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের এক কনকনে শীতের প্রত্যুষে হতভাগ্য নৃপতির গর্বোন্নত শির এইখানেই ঘাতকের কুঠারাঘাতে ভূলুণ্ঠিত হইয়েছিল। বিচারকালে রাজা

চার্লস অবিচল নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সহিত বিদ্রোহী বিচারকগণের বিচারের বৈধতা অস্বীকার করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কোন দুর্বলতা বা কাতরতা দেখান নি। রাজকীয় সম্ভ্রম ও মর্যাদা তিনি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন।

গোটা লণ্ডন শহর যদি এক ঝলকে দেখে নিতে হয় তবে আসতে হবে পিকাডিলি সার্কাসে। এখানে নেই কি? বাজার, দোকান, রেঁস্তোরা, পানাগার, নাইটক্লাব, হোটেল, আর্ট গ্যালারী, গৃহস্থ বাড়ী ও ফ্ল্যাট, হে মার্কেট, বণ্ড স্ট্রীট, ডোভার স্ট্রীট—সবই এখানে রয়েছে পরস্পরকে জড়িয়ে। লণ্ডনের লোকেরা বলে—"If you stand for sometime in Picadilly Circus you will meet the man you want to." মাঝখানে উচ্চবেদীর উপরে এরসের (Eros) মর্মরমূর্তি। চারপাশ দিয়ে চলেছে একটানা যানবাহনের স্রোত। পিকাডিলি হচ্ছে লণ্ডনের স্নায়ু-কেন্দ্র—মহানগরের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করা যায় পিকাডিলিতে। আবার পিকাডিলির একান্তেই হাইড পার্ক। সার্পেণ্টাইনে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে রাজহাঁসের দল। কার্পেটের মত কোমল ঘাসে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে উর্ধ্ব আকাশ-পথে সতত সঞ্চরমান লঘু মেঘদলের দিকে তাকিয়ে অথবা চোখ বুজে ইংলিশ সামারের (summer) কবোষ্ণ আরামটুকু উপভোগ কর—কোন আপত্তি নেই।

ঐতিহ্যময় লণ্ডন

কেবল রাস্তায় রাস্তায় না ঘুরে লণ্ডনের নামজাদা মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারীগুলি দেখে নিলে অল্প আয়াসে অনেক কিছুই জানা ও শেখা যায়। এক লণ্ডন শহরে যত সমৃদ্ধিশালী মিউজিয়াম ও আর্ট

গ্যালারী আছে সারা দুনিয়ার আর কোন শহরে তেমন আছে কিনা সন্দেহ। সব চাইতে নামজাদা ব্রিটিশ মিউজিয়াম। গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে এই জগদ্বিখ্যাত যাদুঘর। গোটা যাদুঘরটি মোটামুটি ভালভাবে দেখতে হলে চার-পাঁচ দিনের কমে হয় না। অসুরীয়, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমক সভ্যতার নিদর্শনের এক অপূর্ব সংগ্রহশালা এই ব্রিটিশ মিউজিয়াম। এখানেই আছে Rosetta stone যার সাহায্যে প্রাচীন মিশরীয় লিপি—Hieroglyphis-এর হদিস পাওয়া গিয়েছিল।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থাগার পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগারের অন্যতম। যে সকল দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন লিপি এখানে সংগৃহীত আছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদের আসল চারটি অনুলিপি, সেক্সপীয়রের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি, স্যার ওয়ালটার র‍্যালের গায়না যাত্রার ডায়েরী, লিওনার্দো ও ভিঞ্চির (Leonardo de Vinci) নোট বই এবং ট্রাফ্‌লগার যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে লেডী হ্যামিলটনের নিকট লিখিত নৌ সেনাপতি নেলসনের অর্ধসমাপ্ত চিঠি।

ট্রাফ্‌লগার স্কোয়ারের সন্নিকটে ব্রিটিশ ন্যাশনাল গ্যালারী—জাতীয় চিত্র-সংগ্রহশালা। এখানে দেখতে পাওয়া যাবে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পিগণের অমর সৃষ্টি। এখানে আছেন গেইন্‌স্‌বরো (Gainsborough), রেনল্ডস্ (Reynolds), ভ্যান ডাইক্ (Van Dyck), জেন ভারমিয়ার (Jain Vermeer) প্রমুখ আরও বহু মহাজন।

মিল্ ব্যাঙ্কের টেট গ্যালারী (Tate Gallery) আর একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রশালা। টেট গ্যালারীর সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য টার্ণার (Turner), ব্লেক (Blake), প্রাক্‌র‍্যাফেলাইট এবং সম-সাময়িক ইংলণ্ডের চিত্রশিল্পের নিদর্শন।

ভিক্টোরিয়া-এ্যালবার্ট মিউজিয়ামটি ভারি সুন্দর। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, চিনামাটির বাসন, খোদাইয়ের কাজ, চিত্র ও অঙ্কন, গ্রন্থাগার, বয়নশিল্প

ও কাঠের কাজ এবং ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন—সব কিছুই এখানে রক্ষিত আছে। ফলিত শিল্পের প্রায় যাবতীয় নিদর্শন এই অপূর্ব সুন্দর যাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে।

সাউথ কেনসিংটনের এক্সজিবিসন রোডের সায়ান্স মিউজিয়ামটিও (Science Museum) কম আকর্ষণীয় নয়। পুরাতন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বিপুল সম্ভার এখানে সংরক্ষিত আছে। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের (Wright Brothers) প্রথম বিমান, ১৯১৯ সনে যে বিমানে এ্যালকক্ (Alcock) ও ব্রাউন (Brown) সর্বপ্রথম অতলান্তিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন এবং সর্বাধুনিক রাডার (Radar) এবং জেট প্রোপেলর (Jet Propeller) সব কিছুই এই যাদুঘরে সাজান রয়েছে।

ডাউটি স্ট্রীটের (Doughty Street) ৪৮ নম্বরের বাড়ীটি হচ্ছে ডিকেন্স হাউস (Dickens House)। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স এই বাড়ীতে উঠে আসেন। দোতলার পিছন দিকের ঘরে বসে ডিকেন্স লেখাপড়া করতেন এবং এই ঘরে বসেই তিনি পিক্উইক পেপার্স, অলিভার টুইস্ট্, বার্ণাবি রুজ, নিকোলাস নিকোলবি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত অমর গ্রন্থরাজি রচনা করেছিলেন। এখানে ডিকেন্সের ব্যক্তিগত নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্র, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ছবি এবং ফটোগ্রাফ ইত্যাদি অনেক কিছুই দেখতে পাওয়া যায়।

কবিতীর্থ লণ্ডন

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত এবং প্রচলিত ভাষা হচ্ছে ইংরেজী। ইউরোপের প্রায় সর্বত্র, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, এসিয়ার

সহরাঞ্চল, দুনিয়ার প্রায় সব জায়গাতেই একটু ইংরেজী জানা থাকলেই মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। স্কেন্‌দিনাভীয় দেশগুলিতে (ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ড) ইংরেজীর বেশ প্রচলন। স্কুলের মাস্টার, ব্যাঙ্কের কেরানী, রেলের টিকিটবাবু, কখনো কখনো হোটেল রেঁস্তোরার পরিচারিকা—সবাই এক-আধটু ইংরেজী জানে। অন্তত ইংরেজী শব্দগুলি বুঝতে পারে। তবে তাড়াতাড়ি বড় বড় sentence বলে গেলে ধরতে পারে না—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে, হয়তো বলবে—I not understand you.

ইংরেজী সাহিত্যের সম্পদ ও সৌন্দর্য জগতের সাহিত্যরসিকদের রসতৃষ্ণা মেটাচ্ছে। বিশ্বসংস্কৃতির ভাণ্ডারে ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠ অবদান তার সাহিত্য। সারা ইংলণ্ডের নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার প্রভৃতির স্মৃতিচিহ্ন। ওয়ার-উইকশায়ারে অ্যাভন নদীর তীরে সেক্সপীয়রের জন্মস্থান। তাদের প্রিয় কবিকে ইংরেজ আদর ক'রে Swan of Avon—এ্যাভনের মরাল—ব'লে ডাকতে ভালবাসে। এখনও রয়েছে সেই পাঁচশো বছর আগেকার পুরানো গির্জা আর কাঠের তৈরী স্কুলবাড়ি। এই স্কুলেই বালক সেক্সপীয়রকে অনিচ্ছায় শামুকের মতো গুটি গুটি যেতে হ'ত—creeping like a snail unwillingly to school. সেক্সপীয়র-গৃহ আজ ইংলণ্ডের ন্যাশনাল ট্রাস্ট সযত্নে রক্ষা করছে। ইংরেজ জাতি কবি, বীর, শিল্পী, জ্ঞানী ও গুণীর প্রকৃত আদর জানে। দেশের মনীষীদের স্মৃতি-বিজড়িত গৃহ, আসবাবপত্র, লাইব্রেরী ইত্যাদি জাতীয় সম্পত্তি বলে গণ্য করা হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হয়।

ইংলণ্ডের যেমন সেক্সপীয়র, স্কটল্যাণ্ডের তেমনি রবার্ট বার্ণস। স্কট-ল্যাণ্ডের এলওয়েতে (Alloway) ১৭৫৯ সনে স্কটদের জাতীয় কবি রবার্ট বার্ণস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খড়ের চালের যে ঘরটিতে কবির

জন্ম হয়েছিল সেটি এখনও অটুট অবস্থায় রয়েছে। তেমনি অ্যাবটস্‌-ফোর্ডে টুইড নদীর তীরে এখনও অক্ষুণ্ণ গৌরবে দাঁড়িয়ে আছে অমর ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের বাস-ভবন। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত হ্রদ-অঞ্চলের (Lake Districts) সৌন্দর্য কী অপরূপ! প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিমুগ্ধচিত্তে হ্রদের তীরে তীরে, পাহাড়ী পথে,—পাইন বনের ছায়ায় আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়াতেন। প্রকৃতির এই লীলানিকেতন কবিচিত্তের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই পাহাড়, সেই বনভূমি, সেই নীল হ্রদ এখনও অম্লান সৌন্দর্যে বিরাজ করছে।

"O, Caledonia sweet and wild,
Meet nurse for a poetic child !"

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো যে যে কবির কাব্যসাধনার সঙ্গে হ্রদ-অঞ্চলের বিশেষ যোগাযোগ ছিল তাঁদের মধ্যে সাদী ও কোলরিজের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিভৃতপল্লী গ্রাস্‌মীয়ারে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্মৃতিবিজড়িত বহু চিহ্ন বক্ষে ধারণ ক'রে সেই কবি-কুঞ্জ "ডাভ্‌ কটেজ"টি Dove-cottage আজও বিরাজমান।

এলস্‌টাও (Elstow) গেলে দেখা যাবে "Pilgrim's Progress"-এর রচয়িতা সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক জন ব্যুনিয়ানের বাসগৃহ। ইয়র্ক-শায়ারে জনবিরল হেওয়ার্থ (Haworth) প্রান্তরে বিখ্যাত ব্রণ্টি (Brontes) ভগ্নীদের বাড়ি। এই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ নির্জন প্রান্তরের পটভূমিকাতেই পরিকল্পিত হয়েছিল "Wuthering Heights"-এর মর্মস্পর্শী প্লট।

প্রাচীন স্যাক্সন রাজাদের রাজধানী ছিল উইনচেস্‌টারে। টমাস হার্ডি (Hardy) এবং জেন অস্টেনের (Jane Austen) সাহিত্য সৃষ্টির অনেক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে উইন্‌চেস্‌টার। পুরানো গির্জার

বাতায়নে দেখা যাবে অস্টেনের স্মৃতিফলক। এখানেই সেই প্রতিভা-শালিনী লেখিকার নশ্বরদেহ মৃত্তিকাগর্ভে সমাহিত রয়েছে। মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে জেন অস্টেন ইংরেজী সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁর অনন্য সৃষ্টি পারিবারিক উপন্যাস (Domestic Novel) উপহার দেন। মেকলে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, স্টিভেন্‌সন্‌ প্রমুখ তদানীন্তন সাহিত্য-ধুরন্ধরগণ একবাক্যে তরুণী লেখিকার প্রতিভার প্রশস্তি গেয়েছিলেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসের প্রতি নজর ও তীব্র রসবোধের জন্য তাঁর সৃষ্টি "প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস" সাহিত্য-জগতে অমরত্ব লাভ করেছে।

ইংলণ্ডের তিনজন অবিস্মরণীয় সাহিত্যস্রষ্টার স্মৃতি জড়িয়ে আছে লণ্ডনের সাউদার্ক (Southwark) পল্লীর সঙ্গে—চসার (Chaucer), সেক্সপীয়র (Shakespeare) এবং ডিকেন্স (Dickens)। ইংরেজী সাহিত্যের আদিস্রষ্টা হচ্ছেন জিওফ্রে চসার। চসারের পূর্বে কতকগুলি চলতি বুলির (dialects) প্রচলন ছিল মাত্র। ক্যাণ্টারব্যারী টেল্‌স্‌ (Canterbury Tales) রচনা ক'রে চসারই প্রথম ইংরাজী ভাষার বুনিয়াদ স্থাপিত করেন। দক্ষিণ লণ্ডনের পল্লী সাউদার্কের এক সরাই-খানায় (tavern) বসেই চসারের মাথায় আসে "ক্যাণ্টারব্যারী টেল্‌সের" প্লট। স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন্‌-অ্যাভনের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বিশ্বকবি সেক্স-পীয়ারের নাম—কারণ এখানেই মহাকবি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু সাউদার্কের গৌরবও বড় কম নয়। এখানেই ছিল সেক্সপীয়রের কর্মস্থল—সেই বিখ্যাত গ্লোব থিয়েটার (Globe Theatre) যাকে মহাকবি "Wooden O" নামে অভিহিত করেছেন। আবার এই সাউদার্ক পল্লীতেই প্রথম লণ্ডনে এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন চার্লস ডিকেন্স। এখানেই শুরু হয়েছিল তাঁর সাহিত্য-পরিক্রমণ। তিনজন সাহিত্য মহারথীর স্মৃতি সগৌরবে বক্ষে ধারণ ক'রে রয়েছে এই সাউদার্ক পল্লী।

প্রাচীন গ্রীসের পরেই যে ইউরোপীয় দেশ কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীত নাটক চর্চার জন্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সে হচ্ছে ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের মাটিতে যত কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতকারের অভ্যুদয় হয়েছে তেমনটি কোথাও দেখা যায় না। ভাব-ব্যঞ্জনা, কল্পনার অবাধ ব্যাপ্তি ও বর্ণনা-বৈচিত্র্যে ইংরেজী সাহিত্যের তুলনা নাই। সারা ইংলণ্ড ও লণ্ডন শহরে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য স্রষ্টা ও পথিকৃতের পদচিহ্ন। বাঙ্গালী কবির ভাষায়—

কবি-গুঞ্জনে এ ধূলিপুঞ্জ ধরেছে কুঞ্জবনের
ছিরি,
জগৎ উজল যাঁর প্রতিভায় সেক্সপীয়রের
উদয়গিরি।

কেনসিংটনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উইলিয়ম মেক্‌পিস থ্যাকারের (William Makepeace Thackeray) নাম—যাঁর অক্ষয় কীর্তি হচ্ছে ভ্যানিটি ফেয়ার (Vanity Fair)। প্যাডিংটনের (Paddington) সঙ্গে রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Browning), পুটনির (Putney) সঙ্গে সুইনবার্ণ (Swinburne) এবং চেলসিয়ার (Chelsea) সঙ্গে বিজড়িত আছে কার্লাইলের স্মৃতি। লণ্ডনের অনতিদূরে আর একটি সাহিত্য-তীর্থ অ্যায়ট সেণ্ট লরেন্স (Ayot St. Lawrence) যেখানে বাস করতেন অক্ষয়কীর্তি জর্জ বার্ণার্ড শ (George Bernard Shaw),—যাঁর ক্ষুরধার লেখনীর তীব্র কশাঘাতে ইংলণ্ডের সমাজ সচকিত হয়ে উঠেছিল।

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এলিজাবেথীয় যুগ (Elizabethian Period) একটি সুবর্ণ যুগ। সেই মধ্যযুগীয় লণ্ডনের সরাইখানাগুলি ছিল তদানীন্তন সাহিত্যিকগণের আড্ডা। এই সব আড্ডায় সমাজ-সাহিত্য-রাজনীতি-ধর্ম-প্রেম-পরকীয়া তাবৎ সব কিছু বিষয়েরই আলো-

চনা হ'ত। আলোচনা যে কখনো কখনো উৎকট বাদ-বিতণ্ডায় পরিণত না হত তেমন নয়। মাতলামি, গুণ্ডামি এমন কি খুন খারাবীও কখনো কখনো হত। তীক্ষ্ণধী ক্রাইস্‌টোফার মার্লো (Christopher Marlowe) সরাইখানার খুনোখুনিতেই নিহত হয়েছিলেন। সাহিত্যখ্যাতিসম্পন্ন যে কয়টি সরাইখানা লণ্ডনের দ্রষ্টব্যের মধ্যে গণ্য করা যায় তেমন কয়েকটির নাম—চিপ্‌সাইডের (Cheapside) "দি মারমেইড" (The Mermaid) ; ইস্টচিপের (East Cheap) বোর্‌স হেড (Boar's Head) ; ওল্ড যিউরির (Old Jewry) দি উইণ্ডমিল (the Wind Mill) ; ফ্লিট স্ট্রীটের (Fleet Street) দি ডেভিল্ (the Devil)—এই-গুলিতে নিয়মিত আনাগোনা করতেন এবং আড্ডা জমাতেন বেন জনসন (Ben Johnson), ক্রাইস্টোফার মার্লো (Christopher Marlowe) এবং সেক্সপীয়র (Shakespeare)। ওল্ড মিটার (Old Mitre) টেভার্ণে (tavern) যাতায়াত করতেন সামুয়েল জনসন (Samuel Johnson), বসওয়েল (Boswell) এবং গোল্ডস্‌স্মিথ (Goldsmith)। সাহিত্য-সৃষ্টির অনেক প্রেরণা যোগাত এই সরাইখানাগুলি। সেদিক দিয়ে এদের মাহাত্ম্য বড় কম নয়।

যুদ্ধোত্তর বৃটেন

যুদ্ধোত্তর বৃটেনে পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বিস্ময়কর দ্রুত-গতিতে। সারা লণ্ডনে দু'তিনটি ভিন্ন বাড়ি চোখে পড়লো না যা এখনও বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। হাউস্ অব্ কমন্স জার্মান বোমায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল। নূতন বাড়ি তৈরী হয়েছে, কিন্তু পুরানো ঢং বদলানো হয় নি। নূতন বাড়ি তৈরীর কাজও এগিয়ে চলেছে ত্বড়িত গতিতে। লণ্ডনের উপকণ্ঠে বহু পড়ো জায়গা জুড়ে নূতন শহরের পত্তন হয়েছে—হাল ফ্যাশনের বাড়ি—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

যুদ্ধোত্তর বৃটেনে মানুষের মনের পরিবর্তনও হয়েছে ঢের। সাধারণ লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় কখনো মনে হবে না যে ভারতবর্ষের জমিদারীটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তারা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। বরঞ্চ ভবিতব্যকে যেন তারা অতি সহজেই গ্রহণ ক'রে নিয়েছে। সেই সাম্রাজ্যবাদী উন্নাসিকতা নেই বললেই চলে। তবে ইংরেজ স্বভাবতই বাক্‌সংযমী। বাইরে থেকে একটু দাম্ভিক বলেই যেন মনে হয়। কিন্তু সেটা ততটা দাম্ভিকতা নয় যতটা তার চরিত্রের উপর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর প্রভাব। দ্বীপবাসী ইংরেজ মনে করে তার এই দ্বীপই বুঝি জগতের সব—আর তারাই বুঝি জগতের সেরা। কিন্তু যাঁরা চিন্তাশীল, যাঁরা শিক্ষায় অগ্রণী তাঁদের মনোভাবে এই সঙ্কীর্ণতার আভাস পাওয়া যায় না। বরঞ্চ তাঁদের কথাবার্তায় ও আচরণে বুঝা যায় যে ইংরেজ আজ প্রকৃতই শান্তিপ্রয়াসী। সোয়ান-সী (Swansea) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্‌টর টম হিউজেস্ গ্রীফিথ্‌স্ (Dr. Tom Hughes Griffiths) "আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ" (International Relations) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও সুবক্তা। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ, কেনিয়ার মাউ মাউ সমস্যা, পূর্ব-আফ্রিকার পুনর্গঠন প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিলেন।

তাঁর বক্তৃতার মূল বক্তব্য কৃষ্ণকায় অনুন্নত জাতিসমূহের উপর শ্বেতকায় জাতির প্রভুত্ব প্রয়াসের অযৌক্তিকতা। ডক্‌টর গ্রীফিথ স্ উদারপন্থী রাজনৈতিক—সাম্য ও মৈত্রীর অকপট সমর্থক। সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। বক্তার রচনা-পটুতা অপূর্ব এবং মতামতের উদারতা হৃদয়গ্রাহী। শত শত ইংরেজ নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে সভাগৃহ মুখর হয়ে উঠত, যদিও ডাঃ গ্রীফিথ্‌সের অনেক কথাই ইংরেজ ও শ্বেতকায় জাতিসমূহের অপকীর্তির তীব্র সমালোচনা। গ্রীফিথ্‌স্ দম্পতির সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছিল। ভদ্রলোকের

বাড়ি ওয়েল্‌সে (Wales)। ওয়েল্‌শ্‌ (Welsh) বলে তাঁর একটু বৈশিষ্ট্য আছে ব'লে তিনি মনে করেন, এবং নিজে ওয়েল্‌শ্‌ ভাষা ও কেলটিক (Celtic) কৃষ্টির একজন বড় গুণগ্রাহী। শ্রীমতী গ্রীফিথ্‌স্‌ জাতিতে জার্মান। দু'জনেই অত্যন্ত সদালাপী, সহৃদয় এবং ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন।

আর একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল—তিনি হচ্ছেন, ব্রিস্‌টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ব্রিস্‌টল ইনস্‌টিটিউট্‌ অব এডুকেশনের অধিকর্তা, নাম বি. এ. ফ্লেচার (B. A. Fletcher)। সদালাপী, সজ্জন ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। প্রথম যৌবনে একবার চীনদেশের পথে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের এবং সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর অতিথি হিসাবে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। গভীর দরদ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতের এই দুই মহা মনীষীর কথা স্মরণ করেন। একদিন তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "বর্তমান জগতে শিক্ষকের স্থান"। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বর্তমান অ্যাটমিক থিওরীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। বক্তৃতার অন্তে প্রশ্নোত্তরিকার সময় তাঁকে ভারতীয় ঋষি কনাদের পরমানুবাদের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। স্বীকার করলেন যে এ বিষয়ে তিনি অজ্ঞ; কিন্তু জানবার ইচ্ছা আছে, ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। প্রোফেসর ফ্লেচার বহুদিন আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষা-প্রসারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। আফ্রিকানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা শ্বেতকায় জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে নানা তথ্যমূলক আলোচনা করলেন। আফ্রিকানদের নিজভাষা বান্টু (Bantu) এবং আরবী এ দু'য়ের সংমিশ্রণে আর এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে—যার নাম সুহালি (Swahili), অনেকটা উর্দু'র মতো। এই নূতন বর্ণ-সঙ্কর ভাষার সাহায্যেই সে সব অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তারের কাজ চলেছে।

শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকাবাসীদের আর্থিক অবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কফি ও সিজলের (Cisal—পাট বা শণ জাতীয় জিনিস) চাষাবাদ হচ্ছে উন্নততর উপায়ে। পূর্ব-আফ্রিকা অঞ্চলে ইউ-রেনিয়াম (Uranium) খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলে বৈদেশিক মূলধনে যান্ত্রিক শিল্পও দ্রুত প্রসার লাভ করছে। ইথিওপিয়ার এক প্রান্তিক অঞ্চলের অর্ধ-যাযাবর উপজাতিসমূহের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার অভিযানে গিয়ে তাঁকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছিল তার এক অদ্ভুত বর্ণনা দিলেন প্রোফেসর ফ্লেচার। পুরোপুরি একদিনে এক ধূলিধূসর মরুপ্রায় প্রান্তর অতিক্রম ক'রে গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌঁছলেন। সঙ্গে ছিলেন ইথিওপিয়ার শিক্ষা-অধিকর্তা ও বিদ্যালয়-পরিদর্শক। স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে এক সভার আয়োজন হয়েছে। একটা পাহাড়ের কাছে একটা খোলা জায়গায় বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোক জড়ো হয়েছে। পুরুষদের প্রত্যেকের হাতে বর্শা আর স্ত্রীলোকদের প্রত্যেকের সামনেই একটি ছোটখাট পাথরের স্তূপ। ইথিওপিয়ার শিক্ষা-অধিকর্তা প্রথমেই ঐ দেশী ভাষায় স্কুল-স্থাপন ও লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বললেন, কিন্তু বুঝা গেল শ্রোতাদের মনঃপূত হয় নি। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। এই অর্ধ-যাযাবরেরা শিক্ষার ধার বড়ো একটা ধারে না। স্কুল তারা চায় না—এবং শ্বেতাঙ্গদের আবির্ভাব তারা সন্দেহের চক্ষে দেখছে। পুরুষেরা তাদের বর্শা শক্ত মুঠোয় ধরল আর স্ত্রীলোকেরা হাতে তুলে নিল পাথরের ঢেলা। আগন্তুকেরা সংখ্যায় ৬।৭ জন এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এই রকম একটা সঙ্গীন মুহূর্তে শেষ-রক্ষা করল সঙ্গের দু'জন রক্ষী। তারাও ঐ দেশীয় এবং অনেকটা মাতব্বর গোছের। কিছু অঘটনীয় ঘটবার আগেই রক্ষী দু'জন ত্বরিতলম্ফে এগিয়ে গিয়ে দু'জন আফ্রিকানের হাত থেকে দুটো বর্শা কেড়ে নিল আর হাঁটুর উপর রেখে মট্‌মট্‌ ক'রে কাঠের অংশটি দু'খণ্ডে ভেঙ্গে ফেলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উপজাতীয় ভাষায় কী যেন

বললো। পরে জানা গেল যে ওরা এই ব'লে মারমুখো উপজাতীয়দের হুশিয়ার ক'রে দিয়েছিল, "সাবধান, এই সাদা চামড়ার লোকের উপর কোন হামলা করেছো কি, ওই পাহাড়ের ওপার থেকে এরোপ্লেন এসে বোমা ফেলে তোদের সাবাড় করে দেবে।" এতেই ঠিক ফল হলো। পরে এই অঞ্চলে একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল।

আরও যে কয়জন শিক্ষাবিদের সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁদের মধ্যে বৃস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর নলসন (Dr. Knowlson) এবং লণ্ডনের যুব-সংস্থার (Youth Council) অধ্যক্ষ মিঃ লসন (Lawson) এবং মিঃ কুয়েন্স্লারের (Kuenstler) নাম উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-বিষয়ক নানা সমস্যা নিয়ে এঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ ঘটেছিল। পুথি-পুস্তকের সাহায্যে যে সকল তথ্য আমরা পাই তৎসম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নই এঁদের জিজ্ঞাসা করেছি এবং সদুত্তরও পেয়েছি। এঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় একটা ধারণা জন্মেছে যে এরা কেউই সত্য গোপন করবার চেষ্টা করেন না। বিদেশীয়ের কাছে নিজের দেশের প্রকৃত অবস্থা, বিশেষতঃ যদি সেটা অবাঞ্ছনীয় হয়, গোপন ক'রে যাওয়াই সাধারণ লোকের স্বভাব। ইংলণ্ডের শিক্ষা-নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি এঁরা অকপটে সমালোচনা করেন। কোন ব্যবস্থাকেই এরা দোষ-ত্রুটিশূন্য সর্বাঙ্গসুন্দর ব'লে মনে করেন না। প্রচলিত ব্যবস্থাকে সতত পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরও উন্নত ও সময়োপযোগী ক'রে তোলবার আগ্রহ, উদ্যম এবং এক্স্-পেরিমেণ্টের শেষ নেই।

বৃটেনে ভারতীয়

লড়াইয়ের বাজারে হয়েছিল কাঁচা পয়সার অঢেল ছড়াছড়ি। তার জের এখনও মেটে নি,—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। যুদ্ধের

দরুন ইংলণ্ডে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এবং সাকুল্যে জীবিকা-নির্বাহের ব্যয়ভার বেড়েছিল মাত্র শতকরা পাঁচভাগ। অথচ ইংলণ্ডের উপর দিয়েই যুদ্ধের তাণ্ডব-ঝড় বয়ে গিয়েছিল সব চাইতে বেশী। সে তুলনায় ভারতবর্ষে জীবিকা-নির্বাহের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় চারশো পয়েন্ট এবং যুদ্ধের নয়-দশ বৎসর পরেও এই মূল্যস্ফীতির কোন তারতম্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ইংলণ্ডে 'কালোবাজারের' উপদ্রব খুব সামান্যই দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় যখনই কোথাও কালোবাজারের উদ্ভব হ'ত তখুনি গভর্ণমেন্ট সেখানে দ্রব্য-নিয়ন্ত্রণ (Control) শিথিল করে বাজারে প্রচুর মাল ছেড়ে দিতেন, ফলে কালোবাজারের কোন প্রয়োজনই থাকত না। আর এসব দেশের সজাগ প্রভাবশালী ও জনমতের কাছে কালোবাজারী মনোবৃত্তি আদৌ প্রশ্রয় পায় না। সাধারণ লোকের দেশাত্মবোধ এবং সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের বুনিয়াদ এতই শক্ত যে এদেশের মাটিতে কালোবাজারী বিষবৃক্ষ সহজে শেকড় গাড়তে পারে না। সমাজের আবহাওয়াটা এমন যে অসামাজিক ও অকল্যাণকর কোন ব্যাধি তার বিস ছড়াবার বড় একটা সুযোগ পায় না। আমাদের দেশেও যে জনমত নেই তা' বলব না, কিন্তু সে দেশের মত জনমত অতোখানি সক্রিয় এবং শক্তিশালী নয় এবং অনেক বিষয়েই জনমত গঠিত হবার সুযোগই পায় না। এই কালোবাজারের ব্যাপারটাই ধরা যায়। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের নানা-সমস্যার মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ও চোরাবাজার বা কালোবাজারের সমস্যা সর্বাপেক্ষা সঙ্গীন আকার ধারণ করেছে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ঢুকেছে, ওষুধ-বিষুধে ভেজাল ঢুকেছে, বাজারে এমন জিনিস কমই আছে যা নিঃসন্দেহে নির্ভেজাল ব'লে নেওয়া যায়। সকলেই আমরা এই আবহাওয়াটার গুরুত্ব উপলব্ধি করি। বন্ধুমহলে বা আড্ডা-মজলিসে কালোবাজারের বিরুদ্ধে তীব্র

মন্তব্যও ক'রে থাকি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঐ যে পাড়ার মাথায় হঠাৎ-বড়লোক অমুক বাবু রাতারাতি এক তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি হাঁকালেন আর পায়ে-হাঁটা ছেড়ে মোটর ধরলেন,—সবাই জানি তাঁর এই হঠাৎবড়মানুষীর গোপন রহস্যটুকু। কিন্তু ঐ সার্বজনীন পূজার চাঁদার খাতায় মোটা অঙ্কের চাঁদা আর পাড়ার বেকার ছেলেদের ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে তিনিই হলেন পাড়ার সর্বজনমান্য মোড়ল।

কালোবাজারীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে সাগ্রহে এগিয়ে আসবে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা। কাঞ্চন-কৌলিন্যের আশীর্বাদে কালোবাজারী ব্যক্তিটিই হবেন দেশনেতা। কেবল গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়েই আমরা আমাদের সামাজিক কর্তব্য বা নাগরিকের দায়িত্ব পালন করছি ব'লে মনে করি। সুস্থ সমাজ-চেতনার বিকাশ ভিন্ন সমাজ-ব্যাধির নিরসন অসম্ভব। গভর্ণমেণ্টও দেশের মানুষ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যতদিন না প্রকৃত জনমত তৈরী হচ্ছে ততদিন কেবল গভর্ণমেণ্টের দুর্নীতি নিবারণ বিভাগ দ্বারাই কালোবাজার দূর করা সম্ভব হয়ে উঠবে না, এবং তা হচ্ছেও না।

যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের উপর দিয়ে যে ধ্বংসের তাণ্ডব চলেছিল আজ তার কোন চিহ্নই প্রায় চোখে পড়ে না। পার্লামেণ্ট গৃহের "হাউস অব কমন্স" অংশটি বোমার আঘাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল—তার পুনর্নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। মনের ভাঙ্গনও আর চোখে পড়ে না। পূর্ণ উদ্যমে শিক্ষা ও সমাজ সেবার আয়োজন চলেছে। যুদ্ধের সময়েই ইংলণ্ড গ্রহণ করেছিল নতুন ও ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনা,—১৯৪৪ সনের শিক্ষা-আইন। যুদ্ধের সময়েই বিধিবদ্ধ হয়েছিল বিখ্যাত বেভারিজ (Beveridge) আইন—ন্যাশনাল হেলথ্ ইন্‌সিওরেন্স স্কীম। ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার দৌলতে পাচ্ছে সার্বজনীন নিঃখরচা শিক্ষা। আর প্রত্যেক নরনারী

পাচ্ছে বিনা পয়সায় চিকিৎসা আর অতি সামান্য খরচে যে কোন ওষুধ। মাত্র ১ শিলিংএ পাওয়া যায় ডাক্তারের ব্যবস্থা-পত্র অনুযায়ী যে কোন ওষুধ

* * *

গ্রেটব্রিটেনের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে প্রায় আশি হাজার ভারতীয়। এক লণ্ডন শহরেই নাকি দশ হাজার ভারতীয় আছে—আর তার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা প্রায় এক তৃতীয়াংশ—তিন-চার হাজার। যুদ্ধের বাজারে বহুলোকের হাতে এল অঢেল পয়সা, আর সেই পয়সার জোরেই আজ বিলেত যাওয়াটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি সাধারণ ব্যাপার। আগে বিলেতে লোক যেত বেশীর ভাগ পড়াশুনা করবার জন্য—কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সে সময়ে যারা বিলেত যেত তাদের অনেকেই সেখানে অর্জন করেছে নানা বিষয়ে কৃতিত্ব এবং দেশে ফিরে এসে দেশের কাজে করেছে আত্মনিয়োগ। আজও যে সে জাতীয় লোক নেই বা হচ্ছে না তা বলব না, কিন্তু এ কথাও খুব সত্যি যে যারা আজ দলে দলে বিলেত যাচ্ছে—তাদের বেশীর ভাগই হচ্ছে রামাশ্যামা-যদু-মধুর দল যাদের 'বিলেত যাওয়াটাই' মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে কাজের কাজ কিছু করাটা হচ্ছে অনেকটা গৌণ। লণ্ডনের রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী ঘনানন্দজী বল্লেন যে এখানে বহু ছেলে আছে যারা এসেছিল পড়াশুনা করতে, কিন্তু পড়াশুনায় সাফল্য অর্জন করতে যে পরিমাণ অভিনিবেশ ও পরিশ্রম দরকার তার অভাবে পড়াশুনা আর বেশী দূর এগোয় না, ওদিকে বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা পাঠানো হয় বন্ধ,

তখন বাধ্য হয়েই কাজকর্মের খোঁজে বেরুতে হয়। আর বিশেষ রকমের কতকগুলো কাজকর্মও এখানে পাওয়া যায় বেশ। হোটেল-রেঁস্তোরার পরিচারক, অফিসবয়, দোকানের সহকারী ইত্যাদি ধরনের কাজ খুব দুর্লভ নয়। পারিশ্রমিকও পাওয়া যায় মন্দ নয়। আবার অনেক ছেলে নিছক কাজের খোঁজেই আসে এখানে। তিন-চার বছর এদেশে থাকবার পর মনোভাবের হয় একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন। এদেশের চালচলন ও জীবনযাত্রার মান মনের উপর আনে একটা প্রতিক্রিয়া। আর তার নিজের দেশের ধুলো বালিতে ফিরে যেতে মন সরে না। এদিকে কোন যোগ্যতা অর্জন না করলেও মনে মনে আসে একটা আত্মম্ভরিতার ভাব,—অর্থাৎ আমি বিলেত-ফেরত, মানে চাকরির বাজারে কুলীন। দেশে গেলে অন্তত পাঁচ-সাত শো, হাজার টাকার বা ঐ রকমের একটা চাকরি চাই। হয়তো বা ইতোমধ্যে জুটেছে কোন শ্বেতাঙ্গিনী বান্ধবী—সে মোহটাও বড়ো কম নয়! লণ্ডনের রাস্তায় শ্বেতাঙ্গিনী প্রণয়িণীর বাহুবদ্ধ ভারতীয় তরুণ এ দৃশ্য একেবারে বিরল নয়। বহু সংখ্যক ভারতীয় তরুণীও আজ লণ্ডনে ও বৃটেনের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

অনেক বাঙালী ছেলেকে "কী করছেন বা কী পড়ছেন" প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রে যে উত্তর পেয়েছি তার মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় এই,—ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী নিয়ে কী হবে, ওসবে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমরা প্র্যাক্‌টিক্যাল ওয়ার্ক করতে চাই যাতে বেশ দু'পয়সা রোজগার হ'তে পারে। উত্তম কথা। ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর মোহ যতটা কমে ততোই ভালো। কিন্তু প্র্যাক্‌টিক্যাল ওয়ার্কটা কী সেটা জানতে চাইলে বহুক্ষেত্রেই নিরাশ হ'তে হয়। অনুমান হয় প্র্যাক্‌টিক্যাল ওয়ার্ক প্রায় নো ওয়ার্কের সামিল। এবং আসল কথাটাও তাই। বহু লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রই আজকাল উল্লেখযোগ্য কাজ বিশেষ কিছু করে না।

বহু ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর যেটা প্রধান কাজ সেটা হচ্ছে স্তোসাল লাইফের (Social life) অনুশীলন। একদিকে আমরা "অখণ্ড ভারতের" ধ্বজাবাহী আর অপর দিকে বাঙালী-বিহারী-মাদ্রাজী-মারাঠি-পাঞ্জাবী ইত্যাদি নানা দলে বিভক্ত। বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের বিভিন্ন সংস্থা, যাদের কর্মসূচী হচ্ছে মুখ্যত নাচ-গান-অভিনয় ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠান বা আমোদ-প্রমোদ। সর্বভারতীয় কোন সংস্থার সংবাদ লণ্ডনে পেলাম না। 'এত ভঙ্গ' শুধু বঙ্গদেশই নয়। সারা ভারতই ভঙ্গ। মনে হয় ইংরেজ শাসনেও যেন এতটা প্রাদেশিকতা ছিল না, যা আজ স্বাধীন ভারতে নির্লজ্জরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর এই প্রাদেশিকতার দোষে সব চাইতে দোষী বিহারী আর অসমীয়ারা। এদের প্রধান আক্রোশ অবশ্যি বাঙালীর উপর। বাঙালীর জ্বালায় এরা নাকি চাকরি পায় না। এই বাঙালী-বিদ্বেষের বহ্নিতেই পাকিস্তানের কাছে আসামের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের সিলেটরূপ আহুতি। বিহার এবং আসামে একজন ইউরোপীয় অথবা অন্য দেশীয় যে কোন লোকের পক্ষেই চাকরি পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু একজন বাঙালী ছেলের পক্ষে অন্যরূপ। এমনই আমাদের সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টি! বাঙালী যে একেবারেই নির্দোষ তা বলা যায় না। বাঙালী অতিমাত্রায় চাকরি-সর্বস্ব। স্বাধীন ব্যবসা বা কায়িক শ্রম বাঙালীর ধাতে সয় না। বাঙালী দুর্মুখ, বাঙালী স্ব স্ব প্রধান, বাঙালী পরনিন্দুক এবং একতাবিহীন—সব কিছু মেনে নিলেও আজও পর্যন্ত বাঙালীর সর্বভারতীয় দৃষ্টি যেটুকু আছে অপর কারুরই ততটা নেই। বাঙালার বুকে চেপে ব'সে কত মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, মাদ্রাজী, বিহারী, ওড়িয়া দু'পয়সা ক'রে খাচ্ছে—বাঙালী যে তার হিসেব রাখে না তা নয়। কিন্তু অন্ধ প্রাদেশিকতায় বাঙালীর দৃষ্টি এখনও আচ্ছন্ন হয় নি। বিহারী নেতৃবর্গের যুক্তিহীন প্রলাপ, উগ্র হিন্দী-প্রীতি—সব কিছুর পেছনে

যে অনুদার সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় সর্বভারতীয় ঐক্যের পক্ষে তা মারাত্মক।

এই মনোভাবেরই অবাঞ্ছিত অভিব্যক্তি দেখা যায় বিদেশে ভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয়গণের দলাদলি ও রেষারেষিতে। দূর বিদেশে যখন পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠি, বিহারী, বাঙালীরা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দলাদলিতে মত্ত হয় তখন বাস্তবিকই এক জঘন্য লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।